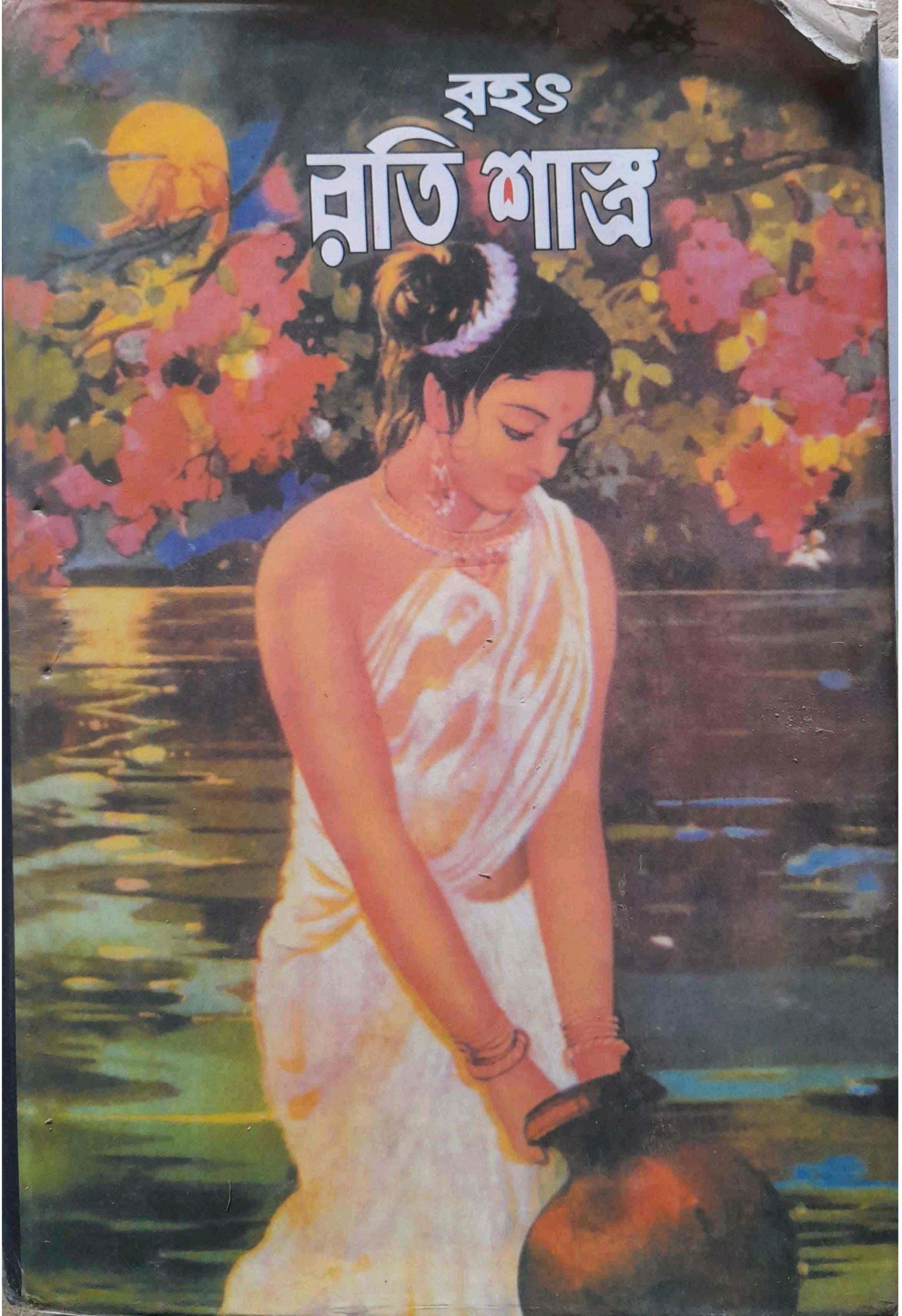
বৃহৎ
রতি শাস্ত্র

প্রকাশক ঃ
রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা-৭০০ ০০১

পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২০১৪ ইং

মুদ্রাকর
শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
মা তারা প্রিন্টিং প্রেস
৪৬, পার্বতী ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

রতিশাস্ত্রের উৎপত্তি ও প্রারম্ভিক কথা

ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি বিশেষ দিক আছে।

আমাদের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ দিক—তা সে সমাজ, দর্শন, জীবনসূত্র, পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা সব কিছুই একটা বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে স্থাপিত।

আর্যজাতির যা-কিছু জীবনদর্শন সবই বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত। আর্য-ঋষিরা অনুভব করেছিলেন, সাধারণ মানুষের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হলে তাদের জীবনের সমস্ত কিছু মূল অংশকেই ধর্মের নিয়মে বাঁধতে হবে। তাই আমরা প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন, বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, সামুদ্রিক বিচার, তন্ত্রমন্ত্র সব কিছুই ধর্মের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই।

বিবাহ তাই আমাদের দাম্পত্য ধর্ম—স্ত্রী তাই সহ-ধর্মিনী অর্থাৎ স্বামীর ধর্ম আচরণকে যে সহায়তা করে।

প্রাচ্য ঋষিদের এই অনাদি গভীর ধ্যানমন্ত্র আমরা যুগে যুগে দেবদেবীর বা স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী বলে বিশ্বাস করে এসেছি।

শুধু বিবাহ নয়—দাম্পত্য জীবন ও রতিপ্রকৃতি সুখমন্ডিত করবার ও এ বিষয়ে বিশদ জ্ঞান দেবার জন্যে যে সব শাস্ত্র রচিত, তাও ভগবান বা দেবদেবীর মুখনিঃসৃত বাণী হিসাবে ব্যক্ত হয়েছে। ভারতের জনগণ যুগে যুগে তা বিশ্বাস করেছে। তাই রতিশাস্ত্র, কামশাস্ত্র বা কামসূত্রম্, কোকশাস্ত্র প্রভৃতি আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকি।

পদ্মপুরাণও পুরাণের একটি অংশ। ব্রহ্মপুরাণ, শিবপুরাণ ইত্যাদির মত এটিও উচ্চ আসন দাবী করে। এর মধ্যে সামাজিক চিকিৎসা, সামুদ্রিক, রতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ অংশ আছে—যা স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব প্রশ্নোত্তরছলে পরমাপ্রকৃতি পার্বতীর কাছে ব্যক্ত করেছেন।

এই পদ্মপুরাণও মনুসংহিতা, যজুর্বেদ, সংহিতা ইত্যাদির মত ভারতীয় জীবনের বিরাট ধর্মের সুমহান ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই পদ্মপুরাণকে আমরা শ্রদ্ধা করি। ভারতীয়রা বিশ্বাস করতেন, বিবাহ শুধু পাশ্চাত্য পদ্ধতির মত কন্ট্রাক্ট বা চুক্তিবদ্ধ দৈহিক মিলন নয়—এ হলো নরনারীর আজীবন ধর্মীয় বন্ধন।

তাই বিবাহকে দৃঢ়ভাবে জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দাম্পত্য জীবনকে প্রকৃত শিল্পের মত প্রকৃত সুমর্যাদা দিয়ে উচ্চ মানবিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে আমাদের শাস্ত্রগুলি।

পদ্মপুরাণের একটি অংশই হলো এই রতিশাস্ত্র। এটি পাশ্চাত্য নগ্ন যৌন আলোচনার মত অশ্লীল নয়—এই গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন পুরুষ ও নারীজাতির লক্ষণ, কিরূপ মিলন উত্তম, কিভাবে শ্রেষ্ঠ সন্তান-সন্ততি লাভ করা যায় বিবাহযোগ্যা কন্যা নির্ণয় ও তাদের নানাবিধ লক্ষণ, নারী-গমনের কালাকাল বিচার, সতী, অসতী, জারজ প্রভৃতি নির্ণয়, সৃষ্টিতত্ত্ব, মানবের ভাগ্য নির্ণয় ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু বর্তমান বইটি শুধু অনুবাদ নয়—প্রতিটি অংশের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এবং বাস্তবে কি ভাবে এই মহান গ্রন্থটিকে অনুসরণ বা এর সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় তেমনিভাবে এর সরল বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। প্রাঞ্জলতা ও বিস্তৃত ব্যাখ্যাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

এ ছাড়া মহর্ষি বাৎস্যায়নের কামসূত্রের কিছু মূল্যবান অংশ এতে সন্নিবিষ্ট। আশা করা যায়, এই গ্রন্থ পাঠে দেবাদিদেব মহাদেবের মুখনিঃসৃত বাণী তথা ভারতীয় রতিবিজ্ঞান সমাজজীবনের পক্ষে কতটা মঙ্গলদায়ক তা বুঝতে এবং সে বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করতে সাহায্য করবে। দাম্পত্য জীবনকে কল্যাণের পরশমণির স্পর্শে সঞ্জীবিত করে তুলে এটি মহামূল্য কোহিনূরের মত দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হবে।

সাধারণ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হ'লে গ্রন্থকার এবং প্রকাশকের পরিশ্রম সার্থক।

কলিকাতা

এস. এন. পাণ্ডে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ		**চতুর্থ পরিচ্ছেদ**	
মহাদেব কর্ত্তৃক রতিশাস্ত্রের প্রশংসা	৫	চারজাতির নারীর শয্যা বর্ণনা	২৫
পুরুষভেদ কথা	৬	পদ্মিনী নারীর শয্যা বর্ণনা	২৫
শশকজাতীয় পুরুষের লক্ষণ ও গুণাগুণ	৭	চিত্রিণী নারীর শয্যা বর্ণনা	২৫
মৃগজাতীয় পুরুষের লক্ষণ ও গুণাগুণ	৭	শঙ্খিনী নারীর শয্যা বর্ণনা	২৬
বৃষজাতীয় পুরুষের লক্ষণ ও গুণাগুণ	৮	হস্তিনী নারীর শয্যা বর্ণনা	২৬
অশ্বজাতীয় পুরুষের লক্ষণ ও গুণাগুণ	৯	**পঞ্চম পরিচ্ছেদ**	
নারীভেদ নিরূপণ	১০	বিবাহের যোগ্যাযোগ্য কুমারী নির্ণয়	২৭
পদ্মিনী নারীর লক্ষণ ও গুণাগুণ	১১	উত্তমা কুমারীর লক্ষণ	৩০
চিত্রিণী নারীর লক্ষণ ও গুণাগুণ	১২	মধ্যমা কুমারীর লক্ষণ	৩০
শঙ্খিনী নারীর লক্ষণ ও গুণাগুণ	১২	অধমা কুমারীর লক্ষণ	৩১
হস্তিনী নারীর লক্ষণ ও গুণাগুণ	১৩	**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ**	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		পুরুষ জাতির বিভিন্ন লক্ষণ ও চিহ্ন বর্ণনা	৩৪
চারি জাতির পুরুষের উপযুক্ত নারী বর্ণনা	১৫	**সপ্তম পরিচ্ছেদ**	
উপযুক্ত পুরুষের ঔরসে উপযুক্ত নারীর সন্তান ও তার স্বরূপ	১৬	নারীদের সুখ-দুঃখের লক্ষণ বর্ণনা	৪৪
সময় ও কারণভেদে পৃথক সন্তান	১৭	**অষ্টম পরিচ্ছেদ**	
পরস্পর ভিন্ন জাতীয় সম্পর্কভেদে সন্তানভেদ	১৯	চার জাতির পুরুষের ললাটের ভাগ্যলিপি	৫১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		নারীর ললাটরেখা বিচার	৫৫
পদ্মিনীর তুষ্টি সাধনের উপায়	২২	**নবম পরিচ্ছেদ**	
চিত্রিণীর চিত্তবিনোদনের উপায়	২২	আদ্যঋতুর ফল	৫৭
শঙ্খিনীর চিত্তরঞ্জনের উপায়	২৩	আদ্যঋতুর তিথিফল	৫৭
হস্তিনীর সন্তুষ্টির উপায়	২৩	আদ্যঋতুর বারফল	৫৯
		আদ্যঋতুর মাসফল	৬০
		আদ্যঋতুর নক্ষত্রগত ফল	৬০
		নন্দাদি পাঁচ তিথিতে আদ্যঋতুর ফল	৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
সিদ্ধিযোগ	৬২
অমৃতযোগ	৬২
পাপযোগ	৬২
নক্ষত্রের পাদভেদে আদ্যঋতুর ফলাফল	৬২
দিবা ও রাত্রিতে আদ্যঋতুর ফল	৬৩
ঋতুর সময়ে নিয়ম ও দিবস গণনাভেদের বিচার	৬৪
দশম পরিচ্ছেদ	
নারীগমনের কালাকাল বিচার	৬৫
নারীগমনের নিষিদ্ধ দিন	৬৫
নারীগমনদোষে পুত্রকন্যার অবস্থা	৬৫
রাত্রির প্রহরভেদে নারীগমনের ফল ও সেই গর্ভে জাত সন্তানের অবস্থা	৬৬
দিনের বেলা নারীগমনের ফল	৬৭
ঋতুর চতুর্থ দিন থেকে চতুর্দশ দিন পর্যন্ত নারীগমনের ফল	৬৭
ঋতুচর্যা ও সহবাসের বিশেষ দোষে সন্তানের বিভিন্ন অবস্থা ভেদ	৬৯
বিভিন্ন দিনে সন্তানভেদ	৭০
তিথিভেদে পুত্রকন্যাভেদ	৭১
ঋতু অবস্থায় কি কি বর্জনীয়	৭২
নারী-মিলনের কতকগুলি বিধি ও নিয়ম	৭২
শিশুর জন্মের পর তার অকাল মৃত্যু ও বিকৃত অঙ্গের কারণ	৭৫
একাদশ পরিচ্ছেদ	
জারজ নির্ণয়	৭৮
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	
সতী ও অসতী নির্ণয়	৮১
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	
কামশাস্ত্র ও শৃঙ্গার	৮৬
শৃঙ্গার	৮৭
আলিঙ্গন	৮৮
রতিক্রিয়াকালে আলিঙ্গন	৮৯
সংবাহন বা অঙ্গমর্দন	৯০
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ	
চুম্বন	৯১
রতিক্রিয়াকালে কামড়ানো	৯৭
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	
দেশভেদে শৃঙ্গার ও কামক্রীড়ার বিভিন্ন রূপ	৯৯
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	
রতিক্রীড়ার বিভিন্ন ভঙ্গি বা আসন	১০২
চিত্ররত	১০৫
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	
পুরুষায়িত বা বিপরীত বিহার	১০৭
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	
বিভিন্ন রোগব্যাধি	১০৯
চিকিৎসা	১১০
রতিশক্তি বৃদ্ধির বিভিন্ন ঔষধ	১১০

কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য!

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, এম. বি. বি-এস., ডি. জি. ও. (গোল্ড মেডেলিস্ট) প্রণীত

নর-নারীর যৌবনের গোপন রহস্য

অসংখ্য রেখাচিত্র সমৃদ্ধ। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে—বহু কেস্ হিষ্ট্রির খোলাখুলি আলোচনা। পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গ, সতীচ্ছদ, স্তন প্রকাশ বৈচিত্র্য, প্রথম মিলন রাতের কর্তব্যাদি, মেয়েদের যৌনলিপ্সা ও যৌনতৃপ্তি সম্পর্কে চিত্রসহ বিশদ আলোচনা।

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

ডাঃ দে সরকার ও রায় প্রণীত

সচিত্র পরিবার পরিকল্পনা

মিলনের পুরোপুরি আনন্দ বজায় রেখেও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব। যোগাসনের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ, ল্যুপ, কনডোম ইত্যাদির ব্যবহার, বীর্যস্তম্ভন, বহির্যোনি ভোগ ইত্যাদি বিষয় অসংখ্য চিত্রের মাধ্যমে বিশদভাবে আলোচিত। মূল্য ঃ আঠার টাকা

ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে অনূদিত

বাৎস্যায়নের কামসূত্র

বাৎস্যায়নের মূল গ্রন্থ থেকে সহজ বাংলায় অনুবাদ। মূল্য ঃ একুশ টাকা

নারীদের যৌন-উত্তেজক কেন্দ্রসমূহ, বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্গার, ৮৪ প্রকার আসন, ৬৪ প্রকার কাম-কলা, উত্তেজক ও তৃপ্তিদায়ক আলিঙ্গন, চুম্বন ও আসনাদি ও কামুকা নারীর তৃপ্তিসাধন বিশদভাবে আলোচিত। এই বইয়ের তুলনা নেই।

বৃহৎ কোকশাস্ত্র

॥ অসংখ্য ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রসহ ॥

বারো টাকা। কাশ্মীরের কোকাপণ্ডিতের মূল রচনার সহজ বাংলা অনুবাদ। নর ও নারীর যৌনাঙ্গ অনুযায়ী কামবাসনার প্রকার ভেদ, নারীর চরম উত্তেজনা ও কামতৃপ্তির কলাকৌশল। চুম্বন নখচ্ছেদ্য, লেহন, মর্দন, প্রভৃতি অসংখ্য শৃঙ্গারের মাধ্যমে যৌন সম্ভোগের মাধুর্য অনুভব করুন।

পুরুষত্বহীনতা

[বহু রেখাচিত্র সহ]

আপনার শুক্রস্খলন কি দ্রুত হয়? যে কোনো কারণের জন্যই হোক আপনার লিঙ্গোত্থান কি দীর্ঘস্থায়ী হয় না? আপনি কি আপনার স্ত্রীকে পূর্ণ তৃপ্তিদানে অক্ষম? এ-ধরনের সমস্যাদি নিরসনের জন্য এ-বইটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। মূল্যঃ পনেরো টাকা।

সচিত্র

বৃহৎ রতিশাস্ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের জনসাধারণের ধারণা দেবত্মা হিমাচল চিরদিন দেবদেবীদের পরম লীলাক্ষেত্র—তাঁদের বিচরণ ভূমি।

ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের একটি অংশ কৈলাস পর্বত—পাশেই মানস সরোবর। প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা নিকেতন। এই কৈলাসেই বিচরণ করেন দেবাদিদেব মহাদেব ও মূল্য শক্তিস্বরূপা দেবী পার্বতী।

একদিন এই হিমাচলের কৈলাস-শিখরে দুজনে অবস্থান করছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব সমাসীন ছিলেন সিদ্ধচারণ-সেবিত রমণীয় কৈলাসে। এমন সময় জগজ্জননীরূপা পার্বতী তাঁকে প্রশ্ন করলেন—

'হে জগন্নাথ, জগৎপতি, নরলোকে কি করে সম্ভোগ প্রবর্তিত হলো সে কথা শ্রবণ করবার জন্যে আমার একান্ত বাসনা হচ্ছে! অতএব আপনি ঐ সমস্ত বিষয়ে আমার কাছে দয়া করে কীর্তন করুন। আমাকে সর্বদা আপনার একান্ত অধীনা বলে মনে করবেন।"

প্রকৃতপক্ষে জননী পার্বতী যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তা ধারণা করলে ভুল হবে। তিনি পরমাশক্তি—তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত কোনও বিষয়ই যে থাকতে পারে না, আমরা ধর্মশাস্ত্র পাঠে তা জানতে পারি।

তবে তিনি কেন এমন প্রশ্ন করলেন?

জনসাধারণের শিক্ষার উদ্দেশ্যেই তিনি এইভাবে প্রশ্ন করলেন এবং বিস্তৃতভাবে মহাদেবের কাছ থেকে সমস্ত শিক্ষা করার মানসে তার ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। প্রকৃত সংস্কৃত শাস্ত্রে যে শ্লোকটি লেখা আছে তা হচ্ছে ঃ

কৈলাসশিখরে রম্য সিদ্ধচারণসেবিতে।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ গৌরী প্রকৃতিরীশ্বরী ॥
কথং মনুষ্যলোকেহস্মিন্ সম্ভোগঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
তদ্বদস্ব জগন্নাথ তদধীনাস্মি সর্ব্বথা ॥

হে দেবাদিদেব, তুমি সুপন্ডিত, সর্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ। এই তিন ভুবনে তোমার অজ্ঞাত বস্তু কিছু নেই। রতিশাস্ত্র অতি গুহ্য, বিচিত্র শাস্ত্র—এর মধ্যে যে সব গুপ্ত তথ্যাদি আছে তা জানবার জন্যে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে।

নরনারী ভেদ, কিরূপ পুরুষের সঙ্গে কেমন নারীর মিলন হয়, সে সব লক্ষণ বলুন। বিবাহের শুভাশুভ তথ্য, কি কারণে পুত্র, কন্যা বা নপুংসক জন্মে, কেউ অল্পদিনে মারা যায়, কেউ দুর্বল, কেউ বা সরল হয় কেন, কেন জীব দশমাস দশদিন জঠর আগারে বাস করে, কি করলে নারীজাতি পতিব্রতা বা ব্যাভিচারিণী হয়, কেউ অধার্মিক, কেউ ধার্মিক হয়, এ সব কারণ শোনবার ইচ্ছা আমার হয়েছে।

পার্বতীর কথা ধীরভাবে শ্রবণ করলেন শূলপাণি। অপূর্ব এক আনন্দে তাঁর হৃদয় ভরে উঠল। সারা মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তিনি বললেন, হে গিরিনন্দিনি, তুমি জগজ্জননী—আদিমাতা প্রকৃতি, জগৎ সংসার তোমার মায়াতে আচ্ছন্ন। কিন্তু দেবি, তুমিই সেই মহামায়ায় বিমোহিত হয়ে যে যাবতীয় পূর্বকথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হচ্ছ এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নেই। শাস্ত্রগত শ্লোক ঃ

ত্বমাদ্যা জগত্যাং মাতা মায়ৈব তব কেবলং।
তয়ৈব মোহিতা ত্বং হি চিত্তমেতৎ নগাত্মজে ॥

মহাদেব তারপর পার্বতীকে সমস্ত প্রাচীন কথা স্মরণ করতে বললেন।

সারা বিশ্বজগতের মাতা পরমা প্রকৃতি পার্বতী। তিনিই অখন্ড অনন্ত সংসারের মূলশক্তি। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাঁর থেকেই উদ্ভূত। শক্তির প্রকাশই হলো এই লক্ষ কোটি ভুবন। তাই এ বিষয়ে সমস্ত কথাই পার্বতী ইচ্ছা করলে ধীরে ধীরে স্মরণ করতে পারেন।

মহাদেব তাই বললেন—হে মহাদেবি, কৈলাস-শিখরে তোমার সঙ্গে বিহারকালে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেই মনোরম পূর্বকথা স্মরণ কর।

সারা পৃথিবী যখন আদিকালে প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন ছিল, সেই কালে আমি (মহাদেব) তোমারই সঙ্গে এই রমণীয় কৈলাস-শিখরে বিরাজিত ছিলাম! শাস্ত্রগত শ্লোক ঃ

স্মর স্মর মহাদেবি পূর্ব্বকথাং মনোরমাং।
কৈলাস-মূর্দ্ধনি জাতাং ত্বয়া সার্দ্ধাং মম প্রিয়ে ॥
জলার্ণবে সংসারেহস্মিন অহমেব ত্বয়া সহ।
কৈলাসশিখরে রম্যে স্থিতবান্ পরমেশ্বরি ॥

তারপর সেই সুদূর অতীত দিনে বিশ্বের যত নরনারীর সৃষ্টি হয়েছিল কিভাবে, সেই বিষয়ে প্রাচীন কথা বলতে গিয়ে মহাদেব জীবসৃষ্টির মূলসূত্র, তাঁর নিজের সঙ্গে জননী পার্বতীর বিহারের কথা পার্বতীর সমীপে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলেন। সব কথা তাঁকে স্মরণ করালেন।

তিনি বললেন—প্রিয়ে, সেকালে তুমি বিহার বাসনা প্রকাশ করেছিলে—আমি তাই তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলাম।

কিন্তু আমি সব সময় উর্দ্ধরেতা হয়ে অবস্থান করতাম। হে বরাননে, সেই সব পূর্বকথা তুমি কেন বিস্মৃত হতে চলেছ?

আমি এই প্রকারে বিহার করতে থাকলেও তাতে তোমার তৃপ্তি সঞ্চার হলো না। তুমি তোমার বিরক্তি প্রকাশ না করায় তা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু তুমি আমার প্রতি কুপিতা হয়ে আমার সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলে। তোমার সেই আকস্মিক প্রস্থানের কারণ আমি ভালভাবে বুঝতে পারলাম না—তাই অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হয়ে উঠলাম।

ত্বয়া সার্দ্ধং তদা রেমে রন্তুকামা চ ত্বং যদা।
উর্দ্ধরেতা সদাহন্তু-বিস্মৃতাসি কথং প্রিয়ে ॥
অতৃপ্তাসি তথাপি ত্বং কুপিতা তু মমোপরি।
অন্তর্হিতা গতা দেবী ব্যাকুলোহহং তদা প্রিয়ে ॥

এইভাবে প্রতিটি বাক্যের শাস্ত্রগত শ্লোক আমরা পর পর একইভাবে প্রদান করছি।

জগৎজননী পার্বতী।

মহাদেব তাই অনন্যোপায় হয়ে কি করেন, কোথায় যান, কিছুই স্থির করতে না পেরে ব্যাকুলিত চিত্তে চঞ্চলভাবে নানাদিকে ভ্রমণ করে করে ক্লান্ত হয়ে হতাশভাবে উপবেশন করতে বাধ্য হলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব দিব্য স্তবমালা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হতে লাগলো।

স্তব ও প্রার্থনায় পার্বতী বিগলিত হলেন। এই স্তব প্রভাবে মহাদেবের কামনা সিদ্ধ হলো—আবার পার্বতী এসে দেখা দিলেন তাঁর সামনে। মহাদেব বন্দনা করলেন—হে দেবি, তুমি আদিমাতা, তুমিই অনন্ত প্রকৃতি, তোমার মায়াকে অনুভব করবার শক্তি এই তিন ভুবনে ক'জনের পক্ষে সম্ভব?

মহাদেব বললেন—হে দেবি, আমি যখন এইভাবে স্তব করে চলেছিলাম, তখন তুমি প্রসন্না হয়ে সহাস্যমুখে আমার সামনে আবির্ভূতা হলে। হে অনঘে, তখন আমি আমার আত্মাকে সার্থক জ্ঞান করতে লাগলাম।

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ইতি চিন্তোপরোহভবম্ ।
স্তবশ্চ তব দেবেশি মন্মুখান্নির্গতোহভবৎ ॥
স্তোত্রস্যাস্য প্রসাদেন সিদ্ধকামো হ্যহং তদা ।
ত্বঞ্চৈব প্রকৃতি দেবি তব মায়া দুরত্যয়া ॥
স্তবেন পরিতুষ্টা ত্বমাবিরভূঃ পুরো মম ।
সস্মিতবদনা দেবি সার্থকোহহং তদানখে ॥

মহাদেবের কাতর প্রার্থনায় গিরিরাজনন্দিনী প্রসন্না হলেন। তিনি তখন আবার মহাদেবের কাছে বিহারের অভিলাষ প্রকাশ করলেন।

মহাদেব তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ করলেন। তখন মহাদেব দেবীকে কামার্ত দেখে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ তাঁর সঙ্গে পরম সুখে ক্রীড়া করলেন।

ধীরে ধীরে কথাগুলি বলে মহাদেব তারপর বললেন—কিন্তু হে পার্বতি, আমি নিষ্কাম যোগী—অর্থাৎ আমি নিষ্কামভাবে তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলাম।

কিন্তু তখন আমার হৃদয়ে কামের সঞ্চার হয়নি। আমার সে বিহার ছিল সম্পূর্ণ কামগন্ধহীন। তাই সেই ক্রীড়াতে তুমি বিন্দুমাত্র পরিতৃপ্ত হতে পারলে না। তখন আমি তোমাকে বললাম—হে দেবি, তুমি কি কারণে আমার প্রতি এভাবে কুপিতা হয়েছিলে?

আমার কথা শুনে তুমি তখন তোমার মনের ভাব পূর্ণরূপে আমার কাছে ব্যক্ত করলে। তখন আমি সব বুঝতে পারলাম।

মহাদেবের হৃদয়ে তখন এর পূর্ব কারণ প্রকটিত হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন কেন দেবী পার্বতী কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারছেন না।

মহাদেব জানেন তিনি নিষ্কাম যোগী।

কিন্তু নিষ্কাম বিহারে বা ক্রীড়ায় পার্বতীর পরিতৃপ্তি হবে না। তাই তিনি তখন পার্বতীর চিত্তবিনোদনের জন্যেই নিজের দেহ থেকে কাম ও রতির সৃজন করলেন।

এইভাবে পার্বতীর চিত্তবিনোদনের জন্য কাম ও রতির সৃষ্টি হলে তিনি কামভাবে তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া করলেন।

মহাদেবের দক্ষিণ অঙ্গ থেকে কামের ও বাম অঙ্গ থেকে সুন্দরী কাম-বিনোদিনী রতির সৃষ্টি হলো।

তখন থেকেই ক্রমে নরনারী প্রভৃতি নানা জীবের সৃষ্টি সুরু হতে লাগল।

নিষ্কামোহহং পরং যোগী তৃপ্তির্ন জায়তে তব ।
অবোচশ্চ মহাদেবী কথং কুপ্যাসি পার্ব্বতী ॥

প্রীত্যর্থং তব দেবেশি সৃজামি মদনং রতিং।
ক্রীড়ামি কামভাবেন প্রজাং সৃজামি চ ক্রমাৎ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশো দক্ষাঙ্গাৎ কামমসৃজৎ ॥
বামাচ্চ সুন্দরীং দেবীং রতিং রতিবিনোদিনীং ॥

তারপর থেকেই জগৎসংসার নরনারীতে সমাকীর্ণ হয়ে উঠল। এই হলো রতিশাস্ত্রমতে জীবসৃষ্টির মূল কথা।

পার্বতীও ক্রীড়াপরায়ণা হয়ে সেই সময় থেকে বিহারে পরিতৃপ্ত হতে লাগলেন। তারপর থেকেই বিহারে হর-পার্বতীর আনন্দ ও জীব-সৃষ্টি একসঙ্গে চলতে লাগল।

তদা প্রভৃতি বিশ্বোহয়ং নরনারীসমাকুলঃ।
ক্রীড়াপরায়ণৌ দেবৌ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥

এইভাবে মহাদেব প্রাচীন রতি ও কামের উৎপত্তি ও তাঁদের রতির উৎপত্তি থেকে বিশ্বজগতের নরনারী, জীবজন্তুর সৃষ্টির কথা বর্ণনা করলেন।

এখানে একটি কথা আছে। তা হলো, এই বর্ণনার মধ্যে কিছুটা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বের সৃষ্টি আর নরনারীর সৃষ্টিতত্ত্বকে বিরাট উচ্চ ও মহান্ আসন দেবার জন্যেই হর-পার্বতীর বিহার থেকে বিশ্বের নরনারী সৃষ্টির কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

এর মূলীভূত কারণ হলো পরমাত্মা অনন্ত, অখন্ড। পরমাত্মা থেকে উদ্ভুত প্রতিটি জীবাত্মা। জীবাত্মা আবার পুরুষ ও প্রকৃতি দুইভাগে ভাগ হয়ে রতিবিহাররূপ আনন্দের মধ্য দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে চলে। জীবাত্মার তৃপ্তি ও আনন্দ পরমাত্মারও আনন্দ। আবার বিশ্বের নরনারীর সৃজন ও বংশবৃদ্ধির জন্যেও রতি ও কামের একান্ত প্রয়োজন।

এই জন্যেই গ্রন্থে এইভাবে রতিশাস্ত্র বিষয়ে প্রারম্ভ বর্ণনা করা হয়েছে।

মহাদেব কর্ত্তৃক রতিশাস্ত্রের প্রশংসা

এইভাবে হর-পার্বতীর বিহার ও কাম রতি ও জগতের নরনারীর সৃষ্টি বিষয়ে বর্ণনা করার পর মহাদেব রতিশাস্ত্রের প্রশংসা করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, পৃথিবীতে রতিশাস্ত্র সর্বশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত।

সমস্ত পৃথিবী এমন কি ত্রিজগৎ পর্যন্ত এই শাস্ত্রের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্বদা এই সুখাবহ শাস্ত্র দিবারাত্র হৃদয়ে চিন্তা করে থাকেন।

এই শাস্ত্রের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারলে হৃদয় পরম সন্তোষ ও সুখের উদয় হয়। সর্বশাস্ত্রে বলে, এই শাস্ত্র অতি প্রয়োজনীয়—জ্ঞেয় শাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম।

এই শাস্ত্র মনোহর রসের আকর। যারা মূর্খ, অহঙ্কারী বা দাম্ভিক তারাই এই শাস্ত্র সম্যক্ বুঝতে না পেরে এ বিষয়ে কদর্থ করে থাকেন।

রতিশাস্ত্র যে অবিদিত থাকে, কেবল নারীর মন ভোলাবার জন্যে তার সঙ্গে ক্রীড়া করে, সে কামগন্ধপূর্ণ পশুর সমান।

এইভাবে মহাদেব রতিশাস্ত্রের প্রশংসা করে—এই শাস্ত্রের অভ্যন্তরে যে যে বিষয়গুলি আছে তার বিস্তৃত বর্ণনায় ব্রতী হলেন। সে সব বিষয়ে একে একে বর্ণনা করা হবে।

রতিশাস্ত্রং বিনা দেবি নাস্তি শাস্ত্রং ধরাতলে।
অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা পৃথ্বী অস্মিন্নেব জগত্রয়ং॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ইন্দ্রাদ্যা অসুরদ্বিষঃ।
চিন্তয়ন্তি হৃদা সর্ব্বে শাস্ত্রমেতৎ সুখাবহং॥

পুরুষভেদ কথা

রতিশাস্ত্রগ্রন্থের প্রারম্ভে সর্বপ্রথম রতিশাস্ত্রানুযায়ী নারী ও পুরুষকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

চারটি জন্তুর সঙ্গে চার জাতির পুরুষকে তুলনা করা হয়েছে। ওই জন্তুগুলির প্রকৃতি যেন কিছুটা প্রতিফলিত হয় এই মানুষগুলির মধ্যে।

শুধু প্রকৃতি নয়, দেহ, রতিবিহার, মানসিক অবস্থা সব দিক বিচার করে এই চারটি ভাগ বর্ণনা করা হয়েছে।

অবশ্য বিশ্বের যাবতীয় পুরুষ বা নারী এই চার ভাগেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়।

দুই ধরনের গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ মাঝামাঝি বহু নরনারী আছে এই পৃথিবীতে। তবে মোটামুটি ভাগের জন্যে এই চারটি ভাগই ধরা হয়ে থাকে। তাই এই চারটি ভাগের বর্ণনা—সুন্দর তুলনামূলক। এই বিভাগ যুগ যুগ ধরে আমাদের মধ্যে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

চার জাতির পুরুষ হলো—

(১) শশক জাতীয় পুরুষ। (২) মৃগী জাতীয় পুরুষ।
(৩) বৃষ জাতীয় পুরুষ। (৪) অশ্ব (তুরগ) জাতীয় পুরুষ।

চত্বারঃ পুরুষাশ্চৈব স্ত্রীজাতীয় স্তথৈব চ।
আদৌ শশশ্চ মৃগশ্চ বৃষশ্চৈব তৃতীয়কঃ॥
চতুর্থস্তুরগশ্চৈব নরা এতে চতুর্ব্বিধাঃ।
বক্ষ্যামি লক্ষণঞ্চেষাং শৃণুষ্বাবহিতা মম॥

চার জাতীয় পুরুষের নামকরণ করবার পর প্রত্যেক বিষয়ের পুরুষের নাম লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে।

শশক জাতীয় পুরুষের লক্ষণ ও গুণাগুণ

শশক জাতীয় পুরুষের দেহ নাতিখর্ব ও নাতিদীর্ঘ হয়ে থাকে। তার শরীর কন্দর্পের মত অপরূপ কান্তিবিশিষ্ট ও সুলক্ষণযুক্ত।

শশক জাতীয় পুরুষের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র পাপ থাকে না। সে ব্যক্তি সবসময় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে। গুরু, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি থাকে হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা—তাদের সে মনে-প্রাণে পূজা করতে ভালবাসে। সে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হয়ে দিনযাপন করে থাকে—নিরন্তর কৃষ্ণকথা শুনতে সে অত্যন্ত ভালবাসে।

শশক জাতীয় পুরুষ শিষ্ট, শান্ত ও পরোপকারপ্রবৃত্তিযুক্ত হয়ে থাকে। পরের উপকারেই তার আনন্দ। তার বচন গম্ভীর হয়, মুখমন্ডল সদা প্রফুল্ল ও হাস্যপূর্ণ থাকে। পরের অনিষ্ট কদাচ চিন্তা করতে ভালবাসে না।

শশক জাতীয় পুরুষের মন সাধারণতঃ কামগন্ধহীন হয়ে থাকে। তারা হয় প্রকৃত হৃদয়গত প্রেমিক—উচ্চ মানসিক প্রেম তারা পছন্দ করে। তারা হয় একনিষ্ঠ—একজনকে প্রকৃত ভালবাসতে চায়, বিভিন্ন নারীর প্রতি তাদের আসক্তি দেখা যায় না।

নাতিখর্ব্বো নাতিদীর্ঘঃ কামকান্তিঃ সুলক্ষিতঃ।
আপাপ্না ভক্তিমাংশ্চৈচ গুরু-দেব-দিজার্চ্চকঃ॥ আসক্তি
সদা চ সাধুসংসর্গী কৃষ্ণকথাপরায়ণঃ।
পরদার-বিমুখশ্চ কৃষ্ণকথাসু লালসঃ॥ অনাসক্তি
গভীরবচনঃ শিষ্টঃ শান্তঃ পরোপকারকঃ।
শশকঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ—চিহ্নিতঃ॥

মৃগ জাতীয় পুরুষের লক্ষণ ও গুণাগুণ

মৃগ জাতীয় পুরুষেরা সাধারণতঃ দীর্ঘাঙ্গ হয়ে থাকে। তাদের দেহ সুশীতল মুখমন্ডল সদা হাস্যপরিপূর্ণ থাকে। সেই ব্যক্তি যখন স্নান করে তখন খুব যত্ন করে তার গাত্রমার্জ্জনা করতে ভালবাসে।

মৃগ জাতীয় পুরুষকে তার চলাফেরার ভঙ্গি থেকেও অনেকটা চিনতে পারা যায়। দীর্ঘ অঙ্গ বলে তারা যখন জোরে হাঁটে তখন যেন তারা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে বলে মনে হয়।

এই পুরুষেরা হয় বহুভোজী ও ভোজনবিলাসী। শশকদের থেকে তারা কিছুটা বেশী আহার করতে থাকে। তারা বেশ বলবান হয়ে থাকে তবে বিশেষ স্থূল হয় না। তারা দিনরাত সংগীতে রত থাকতে ভালবাসে, দেবতা ও অতিথির সেবা করে ।

গুরু ও দ্বিজের প্রতি এদের শ্রদ্ধা থাকে—এরাও কৃষ্ণকথা শুনতে ভালবাসে। শশক পুরুষের সঙ্গে এই বিষয়ে ওদের চমৎকার মিল থাকে।

কিন্তু শশক পুরুষের থেকে ওদের প্রধান পার্থক্য এই যে, শশকের মন যেমন নির্মল ও বিশুদ্ধ হয়, পাপের লেশমাত্র থাকে না, মৃগের ঠিক তা নয়। তারা বাইরে অনেক ধর্মপরায়ণ হলেও অন্তরে তারা কিছুটা কপট থাকে। সাধারণতঃ বাইরে থেকে অবশ্য সেটা বুঝতে পারা যায় না।

মৃগ জাতীয় পুরুষরা শশকের থেকে একটু বেশি নারীসঙ্গ-অভিলাষী হয়—তাদের প্রেমের সঙ্গে কিছুটা কামগন্ধ মেশানো থাকে। তবে তারাও বহুনারীতে অত্যধিক আসক্তি পরায়ণ হয় না।

দীর্ঘাঙ্গঃ শীতগাত্রশ্চ উর্দ্ধনেত্রঃ স্মিতাননঃ।
স্নানে সমার্জ্জতে গাত্রমুৎপত্যোৎপত্য গচ্ছতি ॥
বহ্বাশী বলবাংশ্চৈব কৃষ্ণকথাপরায়ণঃ।
রাত্রিন্দিবঃ গীতরতো দেবতাথিসেবকঃ ॥
গুরুদ্বিজার্চ্চকশ্চৈব কঠোরহৃদয়স্তু বৈ।
কপটী মৃগজাতিশ্চ চিহ্ন—সম্মিতঃ ॥

বৃষ জাতীয় পুরুষের লক্ষণ ও গুণাগুণ

বৃষ জাতীয় পুরুষের পা ক্ষুদ্র এবং জিহ্বা দীর্ঘ হয়ে থাকে। ওদের দেহ থেকে গুবাকের গন্ধ বের হয়ে থাকে। ওরা অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজনপ্রিয় হয়ে থাকে। দেহ হয় হৃষ্টপুষ্ট—অনেক সময় ওরা খুব স্থূলাঙ্গও হতে পারে।

ওরা সব সময় নারীদর্শনে অভিলাষী হয়ে থাকে। শুধু দর্শন নয়, মনে-প্রাণেও ওরা নারীসঙ্গ দিবারাত্র কামনা করে থাকে।

এরা নির্লজ্জ ও অধার্মিক হয়ে থাকে। কোনো কথা বলতে বা কোনো অন্যায় কাজ করতে এদের মনে বাধে না।

শৃঙ্গারসাধনপরায়ণ হয় এরা। চিত্ত সর্বদাই মদনানলে কাতর থাকে। এদের মন সর্বদা পাপে রত থাকে—পাপ প্রবৃত্তি যেন এদের মনের সঙ্গে সব সময় জড়িয়ে থাকে। যে কোনো পাপ করতে এদের বাধে না। এদের নিদ্রা বেশি হয় না, চোখ দুটি প্রফুল্ল থাকে। মধ্যমদেহযুক্ত হয় এই পুরুষেরা।

বৃষ জাতীয় পুরুষেরা মৃগ ও শশকের থেকে অনেক বেশি কামপ্রবৃত্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। কামের জন্য কোনো নির্লজ্জ বা পাপ কাজ করতে ওদের মনে বাধে না। এদিক থেকে আগের বর্ণিত দুই জাতির থেকে এরা অগ্রগণ্য। প্রচুর ভোজনের জন্যও এরা স্থূলাঙ্গ হয়ে থাকে। রাসভের (গাধার) চিহ্নযুক্ত এই সব পুরুষেরা।

হ্রস্বপদো দীর্ঘজিহ্বঃ পুগগন্ধিকলেবরঃ।
বহ্বাশী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গো নারীদর্শনলালসঃ ॥
নির্লজ্জো ধর্মহীনোশ্চ পাপেষু নিরতঃ সদা।
শৃঙ্গারে মন আধত্তে মদনাতুরমানসঃ ॥
প্রফুল্লনয়নশ্চৈব নিদ্রাং ন ভজতে বহু ;
রাসভস্যেব চিহ্নস্তু—সম্বিতঃ।
কীর্ত্তনং বৃষজাতেস্তু—লক্ষণঃ বিদ্ধ ॥

অশ্ব জাতীয় পুরুষের লক্ষণ ও গুণাগুণ

মহাদেব অতঃপর অশ্ব জাতীয় পুরুষের লক্ষণাদি বর্ণনা করতে লাগলেন।

অশ্ব জাতীয় পুরুষের দেহ রক্তবর্ণ হয়, শরীর খুব স্থূল হয়ে থাকে। এই জাতীয় পুরুষের ঘুম খুবই কম হয়। তারা দ্রুত চলাচল করতে পারে।

তারা অধার্মিক, মদনকাতর, মিথ্যাবাদী ও দুরাচর হয়ে থাকে। যে কোনো কদাচারে তারা সহজেই রত হয়ে থাকে।

পরনিন্দা, পরচর্চা করতে তারা খুব ভালবাসে। তারা প্রচুর ভোজন করতে পারে এবং ভোজনে তাদের যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষা থাকে। তারা ধর্মহীন ও ক্রোধপরায়ণ হয়।

যে কোনো রমণী দেখলেই তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে ও তার সঙ্গ কামনা করে।

অশ্ব জাতীয় পুরুষেরা অত্যন্ত কামার্ত হয়ে থাকে। ধর্মে তাদের মতি থাকে না। নিজ স্বার্থসিদ্ধি ও কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করবার জন্যে যে কোন কুকর্ম বা কদাচারে তারা লিপ্ত হতে পারে।

অশ্ব জাতীয় পুরুষের রতিশক্তি অন্য তিন জাতীয়ের চেয়ে অনেক বেশি হয়। তবে পরেই অবশ্য বৃষের স্থান।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি অশ্বজাতেস্তু লক্ষণং।
কৃষ্ণাঙ্গো ধর্ম্মহীনশ্চ নিদ্রাং গচ্ছতি কর্হিচিৎ ॥
দ্রুতগামী স্থূলকায়ো মদনাতুরমানসঃ।
মিথ্যাভাষী দুরাচারঃ কদাচারপরায়ণঃ ॥
সদা ক্রোধিতচিত্তশ্চ পরাপবাদকারকঃ।
বহুভোজী সদা তুষ্টঃ সদা ধর্ম্ম-বিবর্জিতঃ ॥
যাং কাঞ্চিৎ রমণাং প্রাপ্য ফুল্লসুরত মানসঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি চতুঃ পুরুষ-লক্ষণং।
অধুনা কিং প্রবক্ষ্যামি কমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

নারীভেদ নিরূপণ

এইভাবে মহাদেব চার জাতির পুরুষের বর্ণনা পার্বতীকে শোনালেন।

পার্বতী সব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার নারীভেদের কথা শুনতে চাইলেন।

মহাদেব বললেন—আগেই বলেছি, চার জাতীয় পুরুষের মত নারীও চার প্রকারের। বিধাতার রাজ্যে জীবসৃষ্টির এমনি মাহাত্ম্য যে প্রত্যেক জাতির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নারীও তিনি ঠিক সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ যেমন ঠিক চার জাতির কিংবা তার মাঝামাঝি মিশ্র জাতির হয়—নারীও তেমনি ঠিক চার জাতির কিংবা তার মাঝামাঝি মিশ্র জাতির হয়ে থাকে।

চার জাতির পুরুষের রতিপ্রকৃতি ও চরিত্র যেমন ভিন্ন হয়—চার জাতির নারীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়ে থাকে।

আবার ঠিক যে যে জাতির পুরুষ, ঠিক তেমনি নারীরাও সেই সেই জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

চার জাতির নারী হলো—

(১) প্রথম জাতীয় অর্থাৎ পদ্মিনী।

(২) দ্বিতীয় জাতীয় অর্থাৎ চিত্রিণী।

(৩) তৃতীয়া নারী অর্থাৎ শঙ্খিনী।

(৪) চতুর্থী নারী অর্থাৎ হস্তিনী।

প্রথমা পদ্মিনী নারী দ্বিতীয়া চিত্রিণী তথা।
তৃতীয়া শঙ্খিনী চৈব চতুর্থী হস্তিনী তথা।
এবং শাস্ত্রোনিতাঃ সিদ্ধাশ্চতুর্দ্ধা নারীজাতয়ঃ ॥

পদ্মিনী নারীর লক্ষণ ও গুণাগুণ

ইতিহাস পাঠকমাত্রেই চিতোরের রাণী পদ্মিনীর নাম হয়ত শুনেছেন। তিনি নাকি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। শাস্ত্রে মহাদেবের বর্ণিত সমস্ত সুলক্ষণ নাকি তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল।

পদ্মিনী জাতীয়া নারী পতিব্রতা হয়ে থাকে। তারা অত্যন্ত ধর্ম-পরায়ণ হয়। সৎপথে থাকতে এবং ধর্ম আচরণ করতে তারা ভালবাসে। অসাধু কথা বা অসৎ আলোচনা করতে তারা একেবারেই পছন্দ করে না।

পদ্মিনী নারীরা পরম রূপবতী হয়ে থাকে। তাদের গাত্র থেকে পদ্মফুলের মত সুন্দর গন্ধ নির্গত হয়। তাদের নেত্র মৃগের মতো মনোহর, কণ্ঠের মিষ্ট ঝঙ্কার কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

তাদের নয়নের সুমনোহর কটাক্ষে যেন সারা জগৎ বিমোহিত হয়ে যায়, এমনি অপূর্ব সে চোখের দৃষ্টি। তারা যখন চলে তখন যেন মরালের কথা মনে পড়ে।

কমলিনীর মতো সদা হাস্যময় তাদের শুভ আনন। তারা পরম স্নেহময়ী ও সর্বপ্রকার সুলক্ষণযুক্ত হয়ে থাকে।

পদ্মিনী নারীকে শাস্ত্রে সর্ব নারীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ উত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সতী পতিব্রতা যা চ সদা ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
মৃগাক্ষী পদ্মগন্ধা চ সুবাণী কোকিলস্বনা ॥
জগন্মোহয়তে যা চ কটাক্ষৈঃ সুমনোহরৈঃ।
মরালগমনা যা চ যা তু স্মিত-শুভাননা ॥
সদা স্নেহময়ী যা তু—সুলক্ষিতা।
শাস্ত্রেষু তাদৃশী নারী পদ্মিনী সা স্মৃতা বুধৈঃ ॥

চিত্রিণী নারীর লক্ষণ ও গুণাগুণ

চিত্রিণী নারীর গুণাবলী অনেকটা পদ্মিনীর মত। তবে পদ্মিনীর দেহের চেয়ে তারা একটু বেশি লম্বা হয়।

চিত্রিণী নারীর দেহও অপূর্ব সুন্দর ও লাবণ্যমন্ডিত, তাদের চিত্ত দৃঢ় অর্থাৎ লোভ ইত্যাদিতে তারা বিগলিত হয় না।

চিত্রিণী নারী সর্বদা জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদিনী হয়ে থাকে—তারা মিথ্যা বাক্য বলা বা তেমন আচরণ পছন্দ করে না। তারা সর্বদা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে। একমাত্র পতি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের প্রতি কদাচ আকৃষ্ট হয় না।

প্রলোভন বা প্রচুর অর্থও সচরাচর চিত্রিণী নারীর মন জয় করতে বা তাদের বিপথগামিনী করতে পারে না।

কাম খুব বেশি থাকে না এই নারীদের। অল্প মিলন বা বিহারেই তারা সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়। তারা সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে—সকলের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করে।

পাপকর্মের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় না। সর্বদা ধর্মপথে থেকে পূজা অর্চনা করতে তারা ভালবাসে। দয়া, ক্ষমা, সততা এই যেন তার অঙ্গের ভূষণ। যে সব নারী এই সব অমূল্য সদ্‌গুণগুলির আধার, তাদেরই শাস্ত্রে চিত্রিণী নারী বলে আখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

সুন্দরী দৃঢ়চিত্তা যা সদা চ সত্যভাষিণী।
সদা ভক্তিমতী চৈব দেবদ্বিজগুরুস্বপি ॥
চিত্তং ন বসতে যস্যাশ্চান্যেষু স্বপতিং বিনা।
অলোপুপা ভবেদ যা চ সন্তুষ্টা স্বল্পমৈথুনে ॥
সর্ব্বেষু প্রিয়বাক্যা চ পাপচিত্তা ন কর্হিচিৎ।
দয়া ক্ষমাশ্চ ধর্ম্মশ্চ যস্যাঃ স্যাদঙ্গভূষণং।
—চিত্রিণী সা কথিতা বুধৈঃ ॥

শঙ্খিনী নারীর লক্ষণ ও গুণাগুণ

শঙ্খিনী নারীর দেহ ও প্রকৃতি অন্য এই প্রকার নারীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে থাকে। এদের পাত্র থেকে সর্বদা ক্ষারের গন্ধ অনুভূত হয়ে থাকে। এদের কেশ হয় দীর্ঘ, নাক হয় ঈষৎ উন্নত, তাই এদের দেহ মোটামুটি ভাল হলে বেশ ভালই দেখায়।

শঙ্খিনী নারী হয় ভোজনবিলাসিনী। সব সময়ই যেন তাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়ে থাকে। তাদের দেহ একটু স্থুল ধরনের হয়। স্তনদ্বয় হয় উন্নত ও কঠোর। এই নারীদের ধর্মে ততটা মতি থাকে না। ধর্ম-আলোচনা বা সৎ কথা এরা ততটা ভালবাসে না। কেউ সুপরামর্শ দিলে সচরাচর তো গ্রহণ করতে চায় না। এরা কুবুদ্ধিমতী হয়। এরা উচ্চ স্বরে হাস্য করতে ভালবাসে। সেই হাস্য-ধ্বনিতে যেন গগন বিদীর্ণ হয়।

একটু স্থুল বলে এদের আকৃতি মোটামুটি সুন্দর হয়।

এরা সর্বদা মদনাতুরা হয়ে কামবশে হাস্য পরিহাস করতে ভালবাসে। নিজ পতিকে ত্যাগ করে সর্বদা অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলন-বাঞ্ছা করে।

এদের হৃদয় কপটতায় পূর্ণ। নিজের প্রবৃত্তি ও কুমনোভাব এরা সর্বদা নানা মিথ্যা কথার আড়ালে গোপন করে। এরা নিরন্তর শৃঙ্গারে উন্মত্ত হয়ে থাকে—আর তা ছাড়া পাপ কথায় দিন রাত্রি কাটাতে ভালবাসে। দেব, দ্বিজ বা গুরুজনে এদের বিন্দু মাত্র ভক্তি থাকে না।

শঙ্খিনী স্যাৎ ক্ষারগন্ধা দীর্ঘকেশোর্দ্ধনাসিকা।
সদা ক্ষুধাবতী সা চ পীনোন্নতঘটস্তনী ॥
গগনোচ্চাতিহাস্যা চ সদা কুবুদ্ধিশালিনী।
সুন্দরী মদনার্ত্তা চ কামহাস্যপরায়ণা ॥
অন্যৈশ্চ কুরুতে বাঞ্ছাং ত্যক্তা তু স্বপতিং শুভং।
সদা শৃঙ্গারমত্তা পাপকথাপরায়ণা ॥
ন বিভেতি সদা সা চ গুরুজনেভ্য এব তু।
—চ শাস্ত্রোক্তং লক্ষণং স্মৃতং ॥

হস্তিনী নারীর লক্ষণ ও গুণাগুণ

হস্তিনী নারীর আকার ও আচরণ সবই অন্য সব জাতীয় নারীদের থেকে একেবারে পৃথক।

হস্তিনীদের মত তাদের শরীর হয় প্রকান্ড—অনেক সময় তারা ভীষণ ভাবে স্থুলাঙ্গী হয়ে থাকে।

তাদের অঙ্গে সব সময় যেন মদগন্ধ প্রবাহিত হতে থাকে। এই নারী নিজের আচারভ্রষ্ট হয়ে সব সময় কদাচারে প্রবৃত্ত থাকে।

এদের মাথায় চুল খুব সামান্য মাত্র থাকে, মুখে মৃদু মৃদু হাসি লেগেই থাকে। চোখদুটি হয় টকটকে লাল। সেই চোখে এরা সব সময় চারিদিকে তাকিয়ে দেখে।

এদের স্তনদ্বয় হয় উচ্চ ও কঠিন এবং স্বর হয় কর্কশ ও গম্ভীর। এরা সামান্য সুন্দরী হয় কিন্তু দেখতে প্রবীণা অর্থাৎ প্রকৃত বয়সের চেয়ে এদের বয়স অনেক বেশি দেখায়।

হস্তিনী নারী সর্বদা মদনবিহ্বলা থাকে ও মদনবশে নির্লজ্জার মতো আচরণ করে। পুরুষের সংস্পর্শে এদের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ও মন আনন্দ রসে পূর্ণ হয়।

এই জাতীয় নারী দিবারাত্রি শৃঙ্গারে মনোনিবেশ করে। নিজের পতির প্রতি রতিকামনা ছাড়া অন্য আকর্ষণ বেশি থাকে না—প্রয়োজন হলে নিজের পতি ছাড়াও অপর পুরুষসহ সুখ সম্মিলন করে থাকে। ওদের পাপপ্রবণতা অত্যন্ত বেশি।

এই জাতীয় নারী কাম এবং স্বার্থের জন্য যে কোন পাপকাজ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত: করে না।

যে সমস্ত নারীরা স্বার্থের জন্য পাপের পথে পা বাড়ায় এবং বিপথগামিনী হয় বা ব্যভিচারিণী হয়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ হস্তিনী জাতীয় ও কিছুটা শঙ্খিনী জাতীয়া নারী।

ধর্মকর্ম বা দেব-দ্বিজ-গুরুজনে ভক্তি ওদের থাকে না। এ বিষয়ে কেউ তাদের উপদেশ দিলেও ওরা অবহেলায় তা উপেক্ষা করে থাকে।

কদাচারী সদা নারী হস্তিনী মদগন্ধিনী।
স্বাচারবর্জ্জিতা স্থূলা স্বল্পকেশা স্মিতাননা ॥
লোহিতনয়না সা চ পীনোন্নত-পয়োধরা।
প্রবীণা সুন্দরী কিঞ্চিৎ গভীরস্বরসংযুতা ॥
নির্লজ্জা মদনে সা তু সদা মদনবিহ্বলা।
রোমাঞ্চিতসমগ্রাঙ্গী পুরুষস্পর্শনাৎ সদা ॥
শৃঙ্গারে মনমাধত্তে কামেন চ অহর্নিশং।
পতিং ত্যক্ত্বা তু সা চ— হন্যৈঃ সুখং সদা ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চারি জাতির পুরুষের উপযুক্ত নারী বর্ণনা

চারি জাতির পুরুষ আর চার জাতির নারীর বিষয়ে মহাদেব পার্বতীকে বললেন। গিরিরাজ-নন্দিনী মন দিয়ে তাঁর কথা শ্রবণ করলেন। কিন্তু এখানেই সব কথার শেষ হলো না। বিধাতা এই বিশ্ব-সংসার যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির পুরুষের উপযুক্ত নারীরও বিধান করেছেন।

শশক পুরুষেরা যেমন ধার্মিক ও উচ্চমনা, পদ্মিনী নারীও ঠিক তেমনি। এইভাবে উপযুক্ত পুরুষের সঙ্গে উপযুক্ত নারীর মিলন হলে তবেই দাম্পত্য জীবন সুখের হয়—তা না হলে দু'জনের মধ্যে বিষম গরমিল হয় এবং দাম্পত্য জীবন অশান্তিতে ভরে ওঠে।

পার্বতী তাই মহাদেবকে সম্বোধন করে বললেন—হে দেব, চার জাতির নারী-পুরুষের বর্ণনা শুনে পরম তৃপ্তি পেলাম। এবারে কোন্ জাতির নারী কোন্ পুরুষের পক্ষে উপযুক্ত এ বিষয়ে বর্ণনা করুন, তা শোনবার জন্যে আমার একান্ত বাসনা হয়েছে।

শ্রুতং ত্বয়েরিতং ব্রহ্মন্ নারী-পুরুষলক্ষণং।
ইদানীং ব্রুহি মে দেব কস্য কা রমণী শুভা ॥

মহাদেব এ কথা শুনে বললেন—তুমি যা জানতে চেয়েছ তা অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ বিষয় সন্দেহ নেই। তুমি মন দিয়ে শ্রবণ কর, আমি এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা করছি।

চার জাতির নারী চার জাতির পুরুষের উপযুক্ত পত্নী হয়ে থাকে। শশক জাতীয় পুরুষ যেমন ধীর শান্ত, নম্র ধার্মিক, পদ্মিনী নারীরাও তেমনি লক্ষ্মীর পাশে নারায়ণ যেমন শোভা পান, শশক পুরুষের সঙ্গে পদ্মিনী নারীর মিলন হলে ঠিক তেমনি দেখায়।

মৃগ জাতীয় পুরুষ যেমন ধার্মিক ও পরার্থপর, তেমনি চিত্রিণী জাতীয়া নারী। তুমি যেমন আমার গৃহিণী, সেইরূপ চিত্রিণীর সঙ্গে মৃগ জাতীয় পুরুষের উপযুক্ত মিলন ঘটে। শঙ্খিনী জাতীয়া নারী বৃষ জাতীয় পুরুষের পক্ষে উপযুক্ত। তাদের মিলন হলে তা মদনের ভার্য্যা রতির মত পরম সুখাবহ হয়।

মন্দোদরীর সঙ্গে যেমন রাবণের মিলন হয়েছিল সার্থক তেমনি হস্তিনী জাতীয়া নারীর সঙ্গে অশ্ব জাতীয় পুরুষের মিলন হলে তারা পরম সুখী হয়।

মহাদেবের কথার মধ্যে আর একটি তাৎপর্য নিহিত আছে।

তিনি চারটি বিখ্যাত পৌরাণিক চরিত্রের উদাহরণ দিয়ে চার জাতীয় নারী এবং পুরুষের বিষয়ে বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন। অর্থাৎ নারায়ণ, মহাদেব, মদন আর রাবণ যথাক্রমে শশক, মৃগ, বৃষ আর অশ্ব জাতীয় পুরুষের প্রতীক।

অপরপক্ষে লক্ষ্মী, পার্বতী, রতি, আর, মন্দোদরী যথাক্রমে পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী আর হস্তিনী জাতীয়া নারীর প্রতীক।

মহাদেবের বর্ণনার মধ্যে যেটুকু জানা গেল তা নারীপুরুষের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রথমেই সুস্পষ্ট জানা গেছে।

যদ্‌যৎ পৃষ্টং ত্বয়া দেবি তদ্‌বক্ষ্যামি সমাসতঃ।
নারী-পুরুষয়োর্ম্মধ্যে যোগ্যাযোগ্যং বিচার্য্যতে ॥
পদ্মিনী রমণী যা চ সৈব শশক-ভামিনী।
শোভতে দ্বৌ মহাদেবি লক্ষ্মীনারায়ণাবিব ॥
মৃগস্য চিত্রিণী ভার্য্যা ভবানীব শিবস্য চ।
বৃষস্য পদ্মিনী চৈব মদনস্য যথা রতিঃ ॥
মন্দোদরী রাবণস্য শোভতে গহিণী যথা।
হস্তিনী তুরগস্যৈব তদা জানীহি পার্ব্বতি।
এষাং পুত্রাঃ যথা স্যুশ্চ তৎ শৃণুষ্ব নগাত্মজে ॥

মহাদেবের বর্ণনা ছাড়াও আমরা নারী-পুরুষের মিলনের বিষয়ে যা জানতে পারলাম তা থেকে উত্তম মিলন, মধ্যম মিলন ও অধম মিলন মোটামুটি বিচার করতে পারি। তা হচ্ছে ঃ

উত্তম মিলন	মধ্যম মিলন	অধম মিলন
(১) শশক—পদ্মিনী	শশক—চিত্রিণী	শশক—হস্তিনী বা শঙ্খিনী
(২) মৃগ—চিত্রিণী	মৃগ—পদ্মিনী	মৃগ—হস্তিনী বা শঙ্খিনী
(৩) বৃষ—শঙ্খিনী	বৃষ—হস্তিনী	বৃষ—পদ্মিনী বা চিত্রিণী
(৪) অশ্ব—হস্তিনী	অশ্ব—শঙ্খিনী	অশ্ব—পদ্মিনী বা চিত্রিণী

উপযুক্ত পুরুষের ঔরসে উপযুক্ত নারীর সন্তান ও তার স্বরূপ

মহাদেব তারপর কোন্ জাতীয় পুরুষ ও নারীর উপযুক্ত উত্তম মিলনে কি জাতীয় পুত্রকন্যা হয় তার বর্ণনায় ব্রতী হলেন।

শশক-ওঁরসে পদ্মিনী নারীর গর্ভে যদি পুত্রকন্যা জন্মে তবে তারা উত্তম হয়। পুত্র হলে সে হয় মহা ধর্মপরায়ণ, কন্যা হলে হয় সে শুদ্ধমতি।

মৃগ জাতীয় পুরুষের সঙ্গে চিত্রিণী জাতীয়া নারীর মিলনে যে পুত্রকন্যা হয় তারাও হয় খুব উচ্চস্তরের। কন্যা হলে সে বিদ্যাধরীর মত যশ, খ্যাতি ও লক্ষ্মীলাভ করে। পুত্র হলে সে গন্ধর্বের মত রূপে গুণে, সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ হয়।

বৃষের ঔরসে শঙ্খিনীর উদরে পুত্রকন্যা হলে সেই পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধার মত বীর হয়, কিন্তু কন্যা হলে সে রাক্ষসীর মত হয়।

অশ্বজাতীয় পুরুষের যদি হস্তিনীর গর্ভে পুত্রকন্যা হয়, তবে পুত্র হলে সে মহাবলশালী হয়, কিন্তু কন্যা হলে সে অতি কামাতুরা হয়।

এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। প্রকৃত উপযুক্ত জাতীয় নারী পুরুষ আজকাল দুর্লভ। প্রায়ই দুই জাতির মাঝামাঝি স্তরের নারীপুরুষ দেখা যায়। তাই মোটামুটি যোটক বিচারের সময় চেহারা আকৃতি মিলিয়ে যেন বিরাট বৈষম্য না ঘটে, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শশকাৎ পদ্মিনীজাতঃ সুতো ধর্ম্মপরায়ণঃ।
কন্যা শুদ্ধমতিশ্চৈব জানীহি নগনন্দিনি ॥
মৃগতশ্চিত্রিণীগর্ভে জায়তে যদি পুত্রকঃ।
গন্ধর্ব্বতুল্যরূপোহসৌ কন্যা বিদ্যাধরী যথা ॥
বৃষতঃ শঙ্খিনীজাতঃ পুত্রো যোদ্ধৃবরঃ স্মৃতঃ।
কন্য তু রাক্ষসী জ্ঞেয়া ইতি শাস্ত্রবিদাং মতং ॥
অশ্বতোহস্তিনীজাতঃ পুত্রো মহাবলঃ স্মৃতঃ।
কন্যা তু মদনোন্মত্তা কথ্যতে পূর্ব্বসূরিভিঃ ॥

সময় ও কারণভেদে পৃথক সন্তান

পার্বতী তারপর মহাদেবকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন—হে দেব, বিভিন্ন সময়ভেদে নারীসংসর্গ করলে কিরূপ পুত্র বা কন্যা জন্মে তা আমাকে বলুন।

কীদৃশো জায়তে পুত্রঃ সম্ভোগাৎ কালভেদতঃ।
অথবা কীদৃশী কন্যা কথয়স্ব মহামতে ॥

মহাদেব বললেন—হে দেবি, জগজ্জননী তুমি যা জানতে চাইলে তা বর্ণনা করছি শোন।

হস্তিনী নারী যদি মাহেন্দ্রক্ষণে গর্ভধারণ করে তাহলে সেই গর্ভে দেবতুল্য সন্তান হয়, আমি স্বয়ং এই নির্দেশ করেছি।

সুন্দরী শঙ্খিনী জাতীয়া নারী যদি বারুণ সময়ে গর্ভধারণ করে তবে সেই গর্ভজাত পুত্র মহাভাগ্যবান আর কন্যা মহাভাগ্যবতী হয়ে থাকে।

মৃগের ঔরসে ও চিত্রিণীর গর্ভের সন্তান যদি অলগ্নে হয় তবে সেই সন্তান মহাদুঃখী হয়।

একথা সর্বদা স্বীকার্য্য যে, নারীর জাতির চেয়েও সময়ের হিসাব কম প্রয়োজনীয় নয়। শুভক্ষণে জন্মিলে সন্তান সুখী ও অশুভক্ষণে জন্মিলে অসুখী হয়। তাছাড়া নারীজাতি ঋতুস্নান করে যার মুখদর্শন করে তার সন্তান ঠিক তারই মত আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

এখন শুভ ও অশুভ সময় নির্ণয় করতে হবে।

কন্যা, তুলা, মিথুন ও ধনুর শেষার্দ্ধ বিবাহের লগ্নমাত্র এই কয়টি শুভ। অপর লগ্নগুলিকে নয় ভাগ করে নিয়ে কন্যা, তুলা, মিথুনের যে যে অংশ হবে তার মধ্যে মেষের তৃতীয়, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম, বৃষের ষষ্ঠ বা নবম অংশ, কর্কটের তৃতীয় বা চতুর্থ, ধনুর সপ্তম আর ষষ্ঠ, মকরের ষষ্ঠ, নবম, কুম্ভের নবম অথবা প্রথম, মীনের চতুর্থ অথবা তৃতীয় এগুলিই জ্যোতিষমতে প্রমাণসিদ্ধ।

এসব লগ্নের সপ্তম, অষ্টম বা দ্বাদশে কখনও যদি কোন শুভগ্রহ না বসে, যদি একাদশ, তৃতীয়, ষষ্ঠ অথবা অষ্টমে কোন পাপগ্রহ অবস্থান করে বা ষষ্ঠে শুক্র হয় তবে তা অশুভ। এছাড়া অন্যগুলি শুভ—যা আগে বর্ণিত হয়েছে। শুভ বাদে বাকী সবগুলিই অশুভক্ষণ ধরতে হবে।

শুভক্ষণ জ্যোতিষের পক্ষে মঙ্গলকারক—অশুভক্ষণ পরম ক্ষতিকারক সন্দেহ নাই।

শৃণু দেবি মহাভাগে যদ্‌যৎ পৃষ্টং ত্বয়ানঘে।
মাহেন্দ্রে হস্তিনী ধত্তে গর্ভং চেৎ রাজনন্দিনি ॥
দেবকল্পং শিশুং সূতে মহাদেবেন ভাষিতং।
বারুণে শঙ্খিনী গর্ভে ধত্তে যদ্যপি সুন্দরী ॥
মহাভাগ্যবতী কন্যাং অথবা সূয়তে শিশুং।
অলগ্নে যদি জাতঃ স্যাচ্চিত্রিণী মৃগতঃ শিশুঃ।
মহাদুঃখী ভবেৎ সোঽপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শুভক্ষণে সুখী চৈব অশুভে চাসুখ ভবেৎ ॥
যস্যাননং ঋতুস্নাতা শুদ্ধা নারী প্রপশ্যতি।
তদনুরূপিনং পুত্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

পরস্পর ভিন্নজাতীয় সম্পর্কভেদে সন্তানভেদ

এবারে উপযুক্ত জাতীয় পুরুষ-নারী ছাড়া পরস্পর ভিন্ন জাতীয় মিলনে পুত্রকন্যা কিরূপ হয় সে বিষয়ে মহাদেব বর্ণনা করতে ব্রতী হলেন।

উত্তম মিলন ছাড়া মধ্যম ও অধম মিলনের পুত্রকন্যার স্বরূপ তিনি বিশ্লেষণ করে বোঝালেন।

শশকের ঔরসে চিত্রিণী নারীর গর্ভে পুত্র হলে সে পরম পন্ডিত হয়। কন্যা হলে সে হয় সদাচারপরায়ণা।

অশ্বের ঔরসে পদ্মিনী নারীর পুত্র হলে সে মহাদুঃখী হয়, কিন্তু কন্যা হলে সে মায়ের গুণ পেয়ে শুদ্ধমতি হয়।

শশকের ঔরসে শঙ্খিনীর পুত্র হলে সে পিতৃগুণ পেয়ে ধার্মিক ও সদাচারী হয়, কিন্তু কন্যা হলে সে অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত অর্থাৎ বদরাগী হয়ে থাকে।

বৃষের ঔরসে পদ্মিনীর পুত্রকন্যা হলে তারা দুরাচারী ও দুষ্কৃতিকারিণী হবে। তারা কিছুতেই ভাল হতে পারে না।

শশকাৎ চিত্রিণীজাতঃ পুত্রো ভবতি পন্ডিতঃ।
অথবা তনয়া জাতা সদাচারপরায়ণা ॥
অশ্বতঃ পদ্মিনী নারী লভতে যদি পুত্রকং।
মহাদুঃখী ভবেৎ সোঽপি কন্যা শুদ্ধমতির্ভবেৎ।
শশকাৎ শঙ্খিনীজাতঃ পুত্রো ভবতি ধার্মিকঃ।
তনয়া ক্রোধমাপন্না ইতি শাস্ত্রবিদাং মতং ॥
পুত্রো বা যদি বা কন্যা পদ্মিনাং বৃষতঃ ভবেৎ।
দুরাচারো দুরাচারা ভবেন্নৈমাত্র শংশয়ঃ ॥

অশ্ব জাতীয় পুরুষের ঔরসে পদ্মিনী নারীর পুত্রকন্যা জন্মিলে তারা অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়। যদি কিছু বাঁচে তারাও খুব দুর্বল হয়ে থাকে।

শশকের সঙ্গে শঙ্খিনীর পুত্র হলে তারা সকলেই অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে।

বৃষের ঔরসে শঙ্খিনীতে পুত্র জন্মিলে সে পুত্র মুর্খ ও কন্যা জন্মিলে সে কলঙ্কিনী হয়ে থাকে।

অশ্বের ঔরসে শঙ্খিনীর পুত্র হলে সে সর্বদা কলহে নিরত থাকতে ভালবাসে—কন্যা হলে সে কটুভাষিণী হয়।

অশ্বতঃ জায়তে পুত্র পদ্মিন্যাং তনয়া তথা।
অচিরাৎ ম্রিয়তে দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
শঙ্খিন্যাং শশকাজ্জাতঃ পুত্রো ভবতি দুর্ব্বলঃ।
বিমূঢ়ো বৃষতঃ পুত্রঃ কন্যা চৈব কলঙ্কিনী ॥
প্রসূতে চাশ্বতঃ পুত্রঃ শঙ্খিনী কন্যাকামপি।
কলহে নিরতঃ পুত্রঃ পুত্রী চ কটুভাষিণী ॥

মৃগের সঙ্গে পদ্মিনীর পুত্র জন্মিলে সেই পুত্র খুব রূপবান হয়ে থাকে। কিন্তু কন্যা হলে সেই কন্যা যদিও রূপবতী হয়, কিন্তু একটু কেকরা (ট্যারা) হয়ে থাকে।

মৃগের সঙ্গে হস্তিনীর জাত কন্যা কৃষ্ণবর্ণ বা কদাকার হয়ে থাকে। পুত্র হলে সে এক অঙ্গহীন হয়।

অশ্বের সঙ্গে চিত্রিণীর জাত পুত্র অত্যন্ত কুটিল ও শয়তান প্রকৃতির ও পরহিংসা দ্বেষপূর্ণ হয়ে থাকে। কন্যা হলে সে অত্যন্ত মদনগর্বিত হয় ও দুরাচারিণী হতে পারে।

অশ্বের সঙ্গে শঙ্খিনীর পুত্রকন্যা যাই হোক না কেন, তারা অত্যন্ত কামাতুরা হবে ও চরিত্রদোষ ঘটবে।

মৃগতঃ পদ্মিনী জাতঃ পুত্রঃ ভর্বাও সুন্দরঃ।
কন্যা রূপবতী জ্ঞেয়া কেকরা শিশু ভামিনি ॥
হস্তিন্যাং মৃগতো জাতা কৃষ্ণা তু কন্যকা ভবেৎ।
একাঙ্গবিহীনঃ পুত্রঃ সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ॥
অশ্বতশ্চিত্রিণীজাতমপত্যং কুটিলং ভবেৎ।
মদনে গর্ব্বিতং চৈব শঙ্খিন্যাং জায়তে যদি ॥

এইভাবে মহাদেব পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নারী-পুরুষের সংসর্গে উৎপন্ন পুত্রকন্যার বিষয়ে বর্ণনা করে বুঝিয়ে বললেন।

তাই পুরুষ ও নারীর বিবাহের সময় বা বিবাহের পূর্বে ভালভাবে বিচার না করলে তাদের পুত্রকন্যা পর্যন্ত তার ফল ভোগ করে। মহাদেব এই কথা বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চার জাতির নরনারী এইভাবে ভাগ করা এবং রতিশাস্ত্র ও রতিপ্রকৃতি অনুসারে তাদের পৃথক পৃথকভাবে ভাগ করে কোন্ পুরুষের সঙ্গে কোন্ নারী উপযুক্ত তা বিচারের এই অপূর্ব পদ্ধতি যে কেবল বিজ্ঞানসম্মত তাই নয়, ভারতীয় রতিশাস্ত্রের এই প্রকৃতিবিচার খুব সূক্ষ্মভাবে ভাগ করে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, যা সারা বিশ্বের যৌন-বিজ্ঞানীদের কাছে পরম বিস্ময়।

চার জাতির নারীর প্রকৃতি আর গুণাগুণ যেমন সম্পূর্ণ পৃথক, তেমনি তাদের সন্তুষ্টির উপায়ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একই নারী জাতি—কিন্তু যেহেতু তাদের শ্রেণী বিভিন্ন, তাই একই ভাবে যে হয় সন্তুষ্ট ও পরম আনন্দিত, অন্য শ্রেণী তাতে বিন্দুমাত্র আনন্দ পায় না।

এই সন্তুষ্টি বিধানের পার্থক্য থেকেই বিভিন্ন জাতিকে বেশ ভালভাবে বিচার করা যায়।

চার জাতির নারীপুরুষের সম্বন্ধে বিস্তৃত সব কথা শুনতে পেলেন পার্বতী।

তিনি তারপর মহাদেবের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আপনার মুখে রতিশাস্ত্র শ্রবণ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। আমার হৃদয়ে যেন দিব্য জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। এখন চার জাতির নারী কি উপায়ে সন্তোষ লাভ করে তা বর্ণনা করুন।

কি ভাবে পদ্মিনী নারী সন্তুষ্টা হয়ে থাকেন, কি উপায়েই বা চিত্রিণীর সন্তোষ বিধান হয়ে থাকে, শঙ্খিনী কিভাবে তৃপ্তি লাভ করে, হস্তিনী নারীর পরিতপ্তির উপায়ই বা কি তা আমার কাছে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন। আমি তা শোনবার জন্য একান্ত প্রয়াসী।

আমি আপনার একান্ত অধীনা, তাই আমার উপর করুণা থাকলে এই জ্ঞানদান থেকে বিরত থাকবেন না।

শাস্ত্রোক্ত ভাষায়—

শ্রুতং ত্বয়েরিতং সর্ব্বং রতিশাস্ত্রং মহেশ্বর।
অধুনা ব্রুহি মে ব্রহ্মন্ নারীণাং তুষ্টিসাধনং ॥
কেন বা পদ্মিনী প্রীতা কেন তুষ্টা চ চিত্রিণী।
শঙ্খিনী কেন প্রীতা স্যাদ্ধস্তিনী বা কথং ভবেৎ।
তৎসর্ব্বং ব্রুহি মে দেব যদ্যস্তি করুণাময়ি ॥

পার্বতীর কথা শুনে মহাদেব মৃদু হেসে বললেন—হে ভগবতি, তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তা এবারে বলছি। পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চার জাতীয়া নারীরা সন্তোষ বিধান কিভাবে হয়ে থাকে এবারে তা বর্ণনা করছি। মন দিয়ে তা শ্রবণ কর।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তৎ পৃচ্ছসি ত্বয়ানঘে।
পদ্মিনী চিত্রিণী চৈব শঙ্খিনী কামিনী তথা।
হস্তিনী চৈব দেব পরিতুষ্যতি যেন বৈ ॥

পদ্মিনীর তুষ্টি সাধনের উপায়

শিব বললেন—প্রথমে পদ্মিনী নারী কিসে তুষ্ট হয় তাই বর্ণনা করছি।

পদ্মিনী নারীরা নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারা কাম বা নির্লজ্জতা পছন্দ করে না। তাই তাদের কাছে কখনও বৃথা নির্লজ্জতা প্রকাশ করা উচিত নয়।

তারা প্রকৃত ধার্মিক। তাই ধর্মকথা ও মিষ্টবাক্য তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তাদের কাছে পুরাণ, উপনিষদ্ ভাগবত ইত্যাদি ধর্ম আলোচনা বা এই সব গ্রন্থ নিয়ে আলাপ আলোচনা করলে তারা সন্তুষ্ট হয়, শাস্ত্র পাঠ ও মধুর আলাপ তাদের সবচেয়ে খুশী করে।

এইসব বাক্য আলাপন ছাড়া তারা রত্ন অলংকারে দেহ বিভূষিত করতে ভালবাসে। বেশি খেতে তারা ভালবাসে না বটে, তবে সুস্বাদু পানীয় তাদের খুব প্রিয়। তাদের সমাদরে ঐ সব প্রদান করলে তারা সুখী হয়।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পদ্মিনী-তুষ্টি সাধনং।
যেন প্রীতা ভবেৎ সা চ তৎ শৃণুষ্ব মহেশ্বরি।
সুখাসনে সমাসীনাং তাঞ্চ পতিপরায়ণাং।
ধর্ম্মেন বচসা ধীমান্ পরিতুষ্যতি সাদরং ॥
মধুরেণ চ বাক্যেন প্রীতিমুৎপাদয়েৎ হৃদি।
ভোগ্যং বহুবিধং দেয়ং রত্নালঙ্কারমুত্তমং।
পানীয়ঞ্চ প্রদাতব্যং তদা স্যাং পরিতোষিতা ॥

চিত্রিণীর চিত্তবিনোদনের উপায়

চিত্রিণী নারীর প্রকৃতি কিছুটা প্রেমপূর্ণ।

তারা প্রেমপূর্ণ ব্যবহার, প্রেমপূর্ণ বাক্য ও হৃদয়গত ভালবাসা পছন্দ করে। তাই তাদের সঙ্গে ঠিক সেই ধরনের ব্যবহার করা উচিত।

চিত্রিণী জাতীয়া নারীরাও ধর্ম আলোচনা পছন্দ করে, তবে সেই সঙ্গে কথা ও কাহিনী—গল্প উপন্যাস ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ বা আলোচনা শুনতে খুব ভালবাসে।

চিত্রিণী নারীদের মন জয় করতে হলে তাদের বা পাশে বসিয়ে প্রেমপ্রীতিপূর্ণ-ভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাদের কাছে নানা উপন্যাস, ইতিহাস ইত্যাদির গল্প করতে হবে ও বশ্যতা স্বীকার করতে হবে।

চিত্রিণী পরমাপ্রীতা যেন ভবেৎ সুরেশ্বরি।
শৃণুষ্কৈকমনাভূয় তদ্‌বক্ষ্যামি সমাসতঃ ॥
বামপার্শ্বে সমাসীনাং চিত্রিণীং চিত্রসুন্দরীং।
প্রেমালাপেন সংভাষ্য ইতিহাসাদিকেন চ ॥
বিজ্ঞাপয়িত্বা বশতাং সন্তোষয়তি তাং ধ্রুবং ॥

শঙ্খিনীর চিত্তরঞ্জনের উপায়

শঙ্খিনী নারীর প্রকৃতি পদ্মিনী চিত্রিণী থেকে অনেকটা পৃথক ধরনের। তাদের প্রকৃতি ওদের থেকে অনেকটা বেশি পরিমাণে কামার্ত। তারা ধর্ম-আলোচনা, শাস্ত্র বা উপন্যাস সাহিত্য আলোচনা মোটেই পছন্দ করে না।

তবে সুমিষ্ট বাক্য, প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ ইত্যাদি তারা পছন্দ করে। তা ছাড়া, সাজসজ্জার ঘটা তাদের খুব বেশি। প্রচুর সজ্জার দ্বারা তারা সর্বদা পুরুষের মন আকর্ষণ করতে প্রয়াসী হয়ে থাকে।

তাই শঙ্খিনী নারীকে শুধু মিষ্ট বাক্য বলে কোন লাভ হয় না। তাদের মিষ্ট প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ করে প্রেম নিবেদন করতে হয়। তারপর নানাবিধ রত্ন, অলংকার ও বিবিধ সুন্দর সুন্দর বস্ত্র আভরণ ইত্যাদি তাদের প্রদান করতে হয়। নিয়ত আকর্ষণীয় মোহিনী ভাষার দ্বারা তাদের চিত্ত প্রফুল্ল করতে হয়।

মিষ্টেন বচসা দেবি নৈব তুষ্যতি শঙ্খিনী।
সা চ তুষ্যতি রত্নেন বিবিধাভরণেন বৈ ॥
মহার্ঘেণ চ বস্ত্রেণ প্রণয়ভাষণেন বৈ।
এতৈঃ সন্তোষিতা নারী শঙ্খিনী তুষ্টমানসা ॥

হস্তিনীর সন্তুষ্টির উপায়

শিব তারপর বললেন—হে মহাদেবি, এতগুলি নারীর সন্তুষ্টির উপায় শুনলে। কিন্তু হস্তিনী নারীর সঙ্গে তাদের কারও তুলনা করা চলে না।

তার কারণ অন্য নারীরা যাতে পরম সন্তুষ্ট হয় তা কোন দিনই হস্তিনা নারীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কি অলংকার, কি রত্নসম্ভার বা বিভূষণরাজি, কি মধুর প্রণয় বচন, কিছুই হস্তিনী নারীর মনকে আকৃষ্ট করতে বা তাদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয় না।

হস্তিনী নারীর প্রকৃতি হলো—সর্বদা কুক্রিয়ায় রত থাকা। কদাচারে থাকতে তারা ভালবাসে। কোন উত্তম প্রকৃতির পুরুষের সঙ্গে ভালভাবে দিনযাপন করা তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

সে চায় কদাচারী, দুষ্ক্রিয়সক্ত অত্যাচারী পুরুষকে।

তাদের সঙ্গে দিনরাত ভূরি ভূরি ভোজন, প্রয়োজন হলে নেশা বা মদ্যপান এবং তাদের সঙ্গে দিবারাত্র নানা প্রকার কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান—এ সব করতে পারলেই, সে সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে।

তা ছাড়া, সে কামার্ত প্রকৃতির—তাই সর্বদা কামার্ত আলোচনা এবং ঐ সব চিন্তা ও কর্ম করে সে প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকে।

রত্নৈর্ব্বা ভূষণৈর্ব্বাপি তথা চ মিষ্টভাষণৈঃ।
বসনেন চ দিব্যেন ন তুষ্যতি কদাচন ॥
প্রণয়ভাষণেনৈব চিত্তঞ্চ নৈব তুষ্যতি।
সদা কদাচারা সা চ কুক্রিয়ানিরতা সদা ॥
ভোজনৈর্ব্বিপুলৈশ্চৈব কুক্রিয়ানুষ্ঠিতৈরপি।
পরিতুষ্যতি হে দেবি হস্তিনী ক্রূরমানসা ॥

মহাদেব বললেন—হে দেবি, তোমার কাছে অত্যুত্তম রতিশাস্ত্রের বিষয় বর্ণনা করে তোমাকে শোনালাম। যারা নিজেদের কল্যাণ ও সকলের মঙ্গল চায়, তারা এই সমস্ত পাঠ করে সেইমত কাজ করবে। এতে তাদের জীবন আনন্দে পূর্ণ হবে, তারাও সর্বদা সুখী হয়ে মহানন্দে দিন কাটাতে পারবে, সন্দেহ নাই।

ইতি তে কথিতং দেবি রতিশাস্ত্রমনুত্তমং।
এতদ্‌বিচার্য্য বিজ্ঞায় ক্রিয়তে শুভাকাঙ্খিভিঃ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চারি জাতি নারীর শয্যা বর্ণনা

মহাদেবের মুখে এ সমস্ত কথা শুনলেন সৃষ্টিরূপা দেবী পার্বতী।

তারপর মধুর বচনে মহাদেবকে সম্ভাষণ করে বললেন—হে দেব, অল্প সময়ে যে কথা শুনলাম তাতে আমি পরম আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেছি।

এখন আমার কাছে তাদের শয্যা বিবরণ বর্ণনা করুন। কিরূপ শয্যায় শয়ন করলে তারা পরম প্রীতিলাভ করে।

দেবীর প্রশ্ন শুনে মহাদেব বললেন—হে দেবি, তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছ, তা অতি উত্তম। বলছি শোন।

পৃষ্টং ত্বয়া মহাদেবি মহ্যং পরমমুত্তমং।
শৃণূষ্বৈকমনাভূয় রাজপুত্রি যশস্বিনি ॥

পদ্মিনী নারীর শয্যা বর্ণনা

শিব বললেন—দেবি, পদ্মিনী নারীর প্রকৃতি যেমন সর্ব বিষয় উত্তম তেমনি তাদের শয্যাটিও উত্তম হলেই তারা তৃপ্ত হয়।

সাধারণ শয্যায় শয়ন করতে তারা ভালবাসে না। তা ছাড়া শয্যা পরিপাটি এবং পরিচ্ছন্ন না হলেও তেমন আনন্দ পায় না।

কুসুমগন্ধে জড়ানো সুপরিচ্ছন্ন কোমল শয্যা—তার সঙ্গে দেবভোগ্য চন্দন ইত্যাদির গন্ধ তারা চায়।

তাই অতীব যত্নে তাদের জন্য সুন্দর পুষ্পশয্যা রচনা করতে হয়।

তারপর সেই শয্যাকে যদি সুগন্ধি চন্দনের গন্ধে চর্চিত করা হয়, তবে তার উপর শয়ন করে পদ্মিনী জাতীয়া নারী অতীব তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

পুষ্পশয্যাং সমাচর্য্য গন্ধচন্দনবাসিতাং।
শেতে বৈ পদ্মিনী নারী চিত্তরঞ্জনহেতবে ॥

চিত্রিণী নারীর শয্যা বর্ণনা

চিত্রিণী নারীরাও পদ্মিনীর মত অতি সুকোমল শয্যা পছন্দ করে।

তাদের জন্যে কুসুমগন্ধ বা পুষ্পশয্যার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে চন্দনের গন্ধে মনে যে ধর্মভাব জেগে ওঠে তা চিত্রিণী নারীর প্রিয়।

তাই কার্পাসজাত তুলা দ্বারা সুকোমল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শয্যা তাদের জন্যে রচনা করতে হয়। তারপর সেই শয্যা সুগন্ধি চন্দন দ্বারা সুবাসিত করবে। সেই শয্যায় শয়ন করে চিত্রিণী নারী পরম তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চিত্রিণী-চিত্তরঞ্জনং।
শয়নং শয়নার্থঞ্চ শৃণুষ্ব রাজনন্দিনি।
কার্পাসশয়নং কৃত্বা গন্ধচন্দনবাসিতং।
শেতে তদুপরি কন্যা চিত্রিণী চিত্রসুন্দরী ॥

শঙ্খিনী নারীর শয্যা বর্ণনা

শঙ্খিনী নারীর মনে ধর্মভাব বিশেষ থাকে না। তাই পুষ্প বা কোনও কিছুর দ্বারাই তাদের শয্যাকে সুশোভিত করার প্রয়োজন হয় না।

তবে তাদের মধ্যে প্রচুর প্রেম ও হৃদয়ে কামভাব থাকে। তাই তারা সুন্দর নরম ও সুপরিচ্ছন্ন শয্যা পছন্দ করে থাকে।

শঙ্খিনী নারীর জন্য তুলাজাত নরম দিব্যশয্যা নির্মাণ করতে হয়।

সেই শয্যা সুপরিচ্ছন্ন, দুগ্ধফেননিভ হওয়া চাই। ওই ধরনের সুকোমল পরিচ্ছন্ন শয্যায় শঙ্খিনী নারীকে শয়ন করালে পরম সন্তোষ লাভ করে।

দিব্যশয্যাং সমাস্তীর্য্য দুগ্ধফেননিভাং শুভাং।
শেতে বৈ রমণী তুষ্টা শঙ্খিনী নাত্র সংশয়ঃ ॥

হস্তিনী নারীর শয্যা বর্ণনা

হস্তিনী নারীর প্রকৃতি যেমন সবদিক থেকেই পৃথক, ঠিক তেমনি শয্যার দিক থেকেও তারা সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের শয্যা পছন্দ করে থাকে।

শিব বললেন—হে প্রিয়ে, এবারে হস্তিনী নারী কিরূপ শয্যা পছন্দ করে তা বর্ণনা করছি, মন দিয়ে শোন।

দিব্যশয্যা তাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। কোনরূপ ফুল বা চন্দনের গন্ধযুক্ত সুবাসিত শয্যাও তারা চায় না।

সুন্দর শয্যার প্রতি তাদের বিশেষ কোন মোহ নেই। পরিচ্ছন্নতা বা কোমলতা যতই হোক না কেন তা তাদের আকৃষ্ট করতে পারে।

মৎস্যমাংসপ্রিয় মদনবিহ্বলা হস্তিনী নারী সুন্দর, সুবাসিত দিব্যশয্যা পরিত্যাগ করে ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

হে দেবি, তোমার কাছে এইভাবে চার জাতির নারীর শয্যা প্রস্তুত ও তাদের আকাঙ্ক্ষিত শয্যার বর্ণনা করে শোনালাম। এগুলি জ্ঞাত হয়ে বিবেচনা করে সেইমত কাজ করলে সকলেই সিদ্ধিলাভ করে থাকে।

মীনমাংসপ্রিয়া চৈব হস্তিনী মদনবিহ্বলা।
শয়নং কীদৃশং তস্যাস্তচ্ছৃণুষ্ব মহেশ্বরি ॥
দিব্যশয্যাং পরিত্যজ্য শেতে ভূমিতলং যদি।
তদা সা পরমা প্রীতা সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি ॥
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং রতিশাস্ত্রমতং যথা।
এতদ্‌বিচার্য্য বিজ্ঞায় তথা কুরু যথামতি ॥

চার জাতির নারীর বিষয়ে সমস্ত কিছু শ্রবণ করা শেষ হলো।

পার্বতী পরম পুলকিত হয়ে এবারে বিবাহ এবং তার বিষয়ে জ্ঞাতব্য অন্যান্য তথ্যাদি শ্রবণ করতে অভিলাষী হলেন। এবারে সে বিষয়ে বলা হচ্ছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবাহের যোগ্যাযোগ্য কুমারী নির্ণয়

পার্বতী চার জাতির নরনারীর বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে মহাদেবকে বললেন—হে দেব, এখন আমার কাছে কুমারীর লক্ষণসমূহ কীর্তন করুন।

বিবাহের উপযুক্ত কুমারী নির্ণয় অত্যন্ত সহজ বিষয় নয়।

উচ্চ বংশে জন্ম নিলে বা আপাতমধুর চেহারা হলেই যে সে উত্তম কুমারী হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

কোন্ নারী বিবাহের যোগ্যা, কে অযোগ্যা, কাকে বিবাহ করলে শুভ ফল হয়, কাকে বিবাহ অশুভ ফলপ্রদ, এসব অত্যন্ত চিন্তা ও বিচারের বিষয়।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের ঋষিবাক্য প্রদত্ত বিধানসমূহ আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলতাম। তাই সেকালে বিবাহে অসুখীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। যাঁরা একটু পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ, তাঁরা সকলেই এই সব শুভাশুভ বিচার করে বিবাহ করতেন এবং সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করতেন।

অবশ্য অসুখী যে ছিল না এমন নয়—তবে তাদের সংখ্যা নগন্য। তার কারণ তারা হয়ত শাস্ত্রমত বিচারে প্রবৃত্ত হতেন না।

আজকে যুগ পালটেছে। মানুষ আজ সব কিছুকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে চায়।

আমরা দেখি, ইচ্ছামত চোখের নেশায় যুবক যুবতীরা বিবাহ বা প্রেমে আবদ্ধ হয় এবং তাদের জীবন অল্পদিনের মধ্যেই বিষময় হয়ে ওঠে।

দাম্পত্য জীবনের সুখ, আনন্দ, সমৃদ্ধি থেকে তারা বিরত হয়—বিবাহ তাদের কাছে বিষবৎ মনে হয়। তাই আজ বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা আমাদের দেশে এত প্রভাব বিস্তার করছে।

কিন্তু আমরা সেই সব প্রথার প্রশংসা যতোটা করে থাকি তা সম্পূর্ণ ভুল। তা আমাদের ভারতীয় রীতি এবং আচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আমরা যদি বিবাহবিচ্ছেদের চিন্তা এত বেশি না করে কি উপায়ে দাম্পত্য জীবন অধিকাংশ সুখময় করে তোলা যায় তা নিয়ে চিন্তা করতাম, তবে দেশ জুড়ে আজ এই বিধান প্রবর্তিত হত না। দাম্পত্য জীবন নিয়েও আজ এই সর্বগ্রাসী সমস্যার সৃষ্টি হত না।

বিবাহবন্ধন যে আজীবনের বন্ধন এই সংস্কার হৃদয়ের মূলে দৃঢ় করে সুখী দাম্পত্য জীবনের অন্বেষণে যদি আমরা ফিরতাম, তাহলে এই কুমারী-বিচারের সার্থকতা যে কতো বেশি তা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারতাম।

বিবাহের যোগ্যা-অযোগ্যা কুমারী নির্ণয়ের শাস্ত্রগত বিধান এবারে বর্ণনা করছি।

বদ ব্রহ্মন্ মহাভাগ কুমারীলক্ষণং শুভং।
কা বা বিবাহনীয়া চ কা ত্যাজ্যা ভবেদ্ ধ্রুবং ॥

পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব অতঃপর বিবাহের যোগ্যা অযোগ্যা কুমারী নির্ণয়ের বর্ণনায় ব্রতী হলেন।

মহাদেব বললেন—শোন দেবি, যে কন্যা শ্যামাঙ্গী, যার কেশরাশি মনোহর, দেহে অল্প অল্প লোমপংক্তি বর্তমান, যে কন্যা মনোহারিণী মনোহর ভ্রূযুক্তা, সুশীলা, মন্থর গতিশালিনী, সুদন্তা ও পঙ্কজাক্ষী এবং যে কন্যার কটিদেশ ক্ষীণ, সেই কন্যা কুলহীনা হলেও কুলের কল্যাণকারিণী হয়ে থাকে। এমন কন্যা খুব বেশি দেখা যায় না সত্য, তবে যদি কখনও এরূপ কন্যা দেখা যায় তবে কুলহীনা হলেও তেমন কন্যাকে বিবাহ করা উচিত।

শাস্ত্রে বলেছেন—'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'—তাই খারাপ কুলে জন্ম নিলেও এরূপ নারী রত্নসদৃশা—তাদের বিবাহ করতে কোন আপত্তি ওঠে না।

শ্যামা সুকেশী তনুলোমরাজী।
সুভ্রুঃ সুশীলা সুগতিঃ সুদন্তা ॥
বেদীবিমধ্যা যদি পঙ্কজাক্ষী।
কুলেন হীনাপি বিবাহনীয়া ॥

মহাদেব আরও বললেন—যে কন্যা ধৃষ্টা, অর্থাৎ অতিরিক্ত কথাবার্তা বলে বা প্রগল্ভা, কুদন্তা অর্থাৎ যার দাঁত উঁচু বা ফাঁক বেশি বা দাঁতের জন্যে মুখের চেহারা খারাপ দেখায়, পিঙ্গলনয়না অর্থাৎ যার চোখের মণি ঠিক কালো না হয়ে একটু পিঙ্গল ধরনের, যার মধ্যদেশ পুষ্ট—অর্থাৎ যার কোমর নিতম্ব ইত্যাদি পুষ্ট কিন্তু অন্য অংশ তত পুষ্ট নয়, যার সারা দেহ লোমে পরিপূর্ণ থাকে, এই ধরনের কন্যার যতো উচ্চ কুলেই জন্ম হোক না কেন—এমন কি সে যদি রাজকন্যাও হয়, তবু সে বিবাহের যোগ্য নয়; সে কন্যা কুলক্ষণযুক্তা—তাকে বিবাহ করা কখনও উচিত নয়।

ধৃষ্টা কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী।
লোম্না সমাকীর্ণপদাঙ্গযষ্টিঃ ॥
মধ্যে চ পুষ্টা যদি রাজকন্যা।
কুহেহপি যোগ্যা না বিবাহনীয়া ॥

মহাদেব তারপর শাস্ত্রমতে আরও কুলক্ষণা নারীর বর্ণনা করতে লাগলেন।

তিনি বললেন—যে কন্যা ধূম্রবর্ণা অর্থাৎ ফ্যাকাশে কালো রঙের অধিকাঙ্গী অর্থাৎ যার দেহে কোন অতিরিক্ত অঙ্গ থাকে (কোন কোন মেয়ের শরীরে হাতে বা পায়ে ছয়টি আঙুল থাকে, এমনি) রোগিণী অর্থাৎ সর্বদা যে নারী রোগে ভোগে, লোমশূন্যা অর্থাৎ যার দেহ এত চকচকে যে খুব সূক্ষ্ম একটি লোম পর্যন্ত নাই, অথবা যার দেহে বেশি লোম থাকে, সে কন্যা কুলক্ষণযুক্তা।

এ ছাড়া বাচাল অর্থাৎ যারা বেশি কথা বলে, পিঙ্গলবর্ণা, নক্ষত্রনামিকা, বৃক্ষনামিকা, নদীনাম্নী, পক্ষিনাম্নী, সর্পনাম্নী, অস্তিগিরি নাম্নী অর্থাৎ নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, পাখি, সাপ বা পাহাড়ের নামে যে মেয়ের নামকরণ হয়ে থাকে অথবা ভীষণানাম্নী অর্থাৎ যে মেয়ের ভয়ংকর নাম হয়, দূতীনামধারিণী অর্থাৎ দূতীর নামে যার নাম হয়, এরূপ কন্যার লক্ষণ ভাল নয়, অর্থাৎ তারা কুলক্ষণযুক্তা। এমন নারীকে কখনও বিবাহ করা উচিত নয়।

এখানে একটা কথা।

নদীনাম্নী, বৃক্ষনাম্নী ও নক্ষত্রনাম্নী কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয় একথা বলা হলেও তার মধ্যে কয়েকটি বিচারে শুভ সূচিত হয়।

গঙ্গা, যমুনা. গোমতী, সরস্বতী এই চার নদীর নাম, তুলসী, মালতী, এই দুই বৃক্ষের নাম এবং রেবতী, অশ্বিনী ও রোহিণী এই তিন নক্ষত্রের নামকরণ হলে তাতে দোষ নেই। এই সব নামের কন্যা অশুভ হয় না।

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোম্নাং ন বাচালাং ন পিঙ্গলাং ॥
ঋক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্তপর্ব্বতনামিকাং।
ন পক্ষ্যহিপ্রৈষ্যনাম্নাং ন চ ভীষণনামিকাং ॥

অন্যত্র

গঙ্গা চ যমুনাচৈব গোমতী চ সরস্বতী।
নদীনাং নামতো বৃক্ষে মালতী তুলসী তথা।
রেবতী চাশ্বিনী তেষু রোহিণী শুভদা ভবেৎ ॥

এ ছাড়া বিবাহের অযোগ্যা আরও কয়েক শ্রেণীর নারীর কথা বলা হয়েছে।

যে কন্যার চক্ষু ট্যারা অর্থাৎ যে নারী কেকরা, যে কন্যা দুঃশীলা বা সকলের অপ্রিয় কার্যাদি করে, সে নারী পিঙ্গলবর্ণা ও হাসলে যার গালে কূপ অর্থাৎ টোল দেখা যায় সেই নারীকে বন্ধকী বলা হয়।

এরূপ নারী বিবাহের যোগ্যা নয়—তাদের কখনও বিবাহ করা উচিত নয়।

নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা
স্যাদ্ দুঃশীলা স্যাদবলোলেক্ষণা চ।
কূপৌ যস্যাঃ গন্ডয়োঃ সস্মিতে চ
নিঃসন্দিগ্ধাং বন্ধকীং তাং বদন্তি ॥

মহাদেব এইভাবে বিভিন্ন সুলক্ষণ ও কুলক্ষণযুক্ত নারীর কথা বর্ণনা করলেন।

তারপর তিনি বিবাহযোগ্যা কুমারীর বিভিন্ন বিভাগ করে তাদের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করতে প্রয়াসী হলেন।

মহাদেব বললেন—শোন দেবি হৈমবতী, জগতে যতো নারীজাতি অর্থাৎ কুমারী নারী আছে, তাদের বিচার করবার জন্যে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

বিবাহযোগ্যা কুমারী বিচার করতে হলে এই ভাগ অনুযায়ী বিচার করে বিবাহে অগ্রসর হওয়া চাই।

মহাদেবের বাক্য অনুসারে জগতের যাবতীয় কুমারীকে তিন ভাগে ভাগ বিভক্ত হ'ল ঃ—

(১) উত্তমা কুমারী। (২) মধ্যমা কুমারী। (৩) অধমা কুমারী।

অবশ্য লক্ষণ অনুযায়ী বিচার করলে অনেক কুমারী আছে যাদের উত্তমার কিছু লক্ষণ ও মধ্যমার কিছু লক্ষণ মেলে, এমনি মাঝামাঝি অনেক নারী দেখা যায়।

তেমনি মধ্যমা ও অধমার মিশ্রগুণযুক্ত কুমারীও দেখা যায়। তবে অধমার গুণ যে কুমারীর মধ্যে বেশি, তেমন কুমারী সর্বদা পরিত্যাজ্য।

তাই বিবাহে বিচার্য বিষয়ের মধ্যে সবার আগে দেখতে হবে এই কুমারী বিচার।

উত্তমা কুমারীর লক্ষণ

মহাদেব সর্বপ্রথমে উত্তমা কুমারীর লক্ষণাদি বর্ণনা করতে লাগলেন।

যে নারীর দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, যার বর্ণ শ্যাম, দেহ ক্ষীণ, গতি গজেন্দ্রের মত, করতল রক্তপদ্মের মত, স্তন খুব উচ্চ নয়, আবার খুব ক্ষুদ্রও নয় এবং যে নারী ধর্মপরায়ণা ও পতিব্রতা, তাকেই উত্তমা নারী বলে জানবে।

সকল বিজ্ঞ লোকের মতে এই উত্তমা কুমারী বা সর্বশ্রেষ্ঠা কুমারী প্রত্যেকটি পুরুষের জীবনকে সুখময় করে তুলতে পারে।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নার্য্যাস্তু ত্রিবিধ মতাঃ ॥
উত্তমা মধ্যমা জ্ঞেয়া তথা চৈবাধমা স্মৃতা ॥
নাতিদীর্ঘা নাতিহ্রস্বা শ্যামাঙ্গী ক্ষীণদেহিকা।
গজেন্দ্র-গামিনী চৈব রক্তপদ্মকরা শুভা।
পতিপরায়ণ যাতু তথা মধ্যবিধস্তনী।
ধার্ম্মিকা চৈব যা নারী সৈবোত্তমা প্রকীর্ত্তিতা ॥

মধ্যমা কুমারীর লক্ষণ

মহাদেব তারপর বললেন—উত্তমা কুমারীর লক্ষণ তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, তা শুনলে। এবারে মধ্যমা কুমারীর দেহে কি কি লক্ষণ থাকে তা বর্ণনা করছি, শোন।

মধ্যমা নারীর দেহ মাঝামাঝি হয়। তারা খুব দীর্ঘ বা বেঁটে হয় না, খুব রোগা বা মোটাও হয় না। তাদের দীর্ঘ চুল থাকে। তারা কোন দিন কোন কাজে আলস্য করে

না। সব কাজ তারা সুন্দররূপে করতে পারে ও তা করতে ভালবাসে। তাদের নাভি গভীর হয়। সুখ ও দুঃখ দুই-ই তাদের কাছে সমান। সব সময় তারা হেসে কথা বলে থাকে। তারা সদাচারপ্রিয় হয় ও মিষ্টভাষায় আলাপ করে থাকে। ধর্মপথে তাদের সব সময় মতি থাকে—অধর্মের পথে আকৃষ্ট হয় না। অল্প আহার করে এই নারীরা আনন্দিত হয়—বেশি ভোজন করতে কখনও ভালবাসে না।

এ নারীরা সকলকে আত্মীয়ের মত দেখে—গুরুজন বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে থাকে। দেব ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রতি তাদের হৃদয় একান্ত ভক্তিতে পূর্ণ থাকে।

এইসব সুলক্ষণ যে সব নারীর থাকে তারা মধ্যমা কুমারী অর্থাৎ তাদের বিবাহ করলে মোটামুটি সুখে দিন কেটে যায়।

মধ্যকায়া দীর্ঘকেশী যদালস্যবিবর্জ্জিতা।
সমভাবা চ যা নারী দুঃখেষু চ সুখেষু চ ॥
সদা হাস্যমুখী যা চ তথা গভীরনাভিকা।
মিষ্টভাষা চ সর্ব্বত্র সদাচার-পরায়ণা ॥
ধর্ম্মে মতিঃ সদা যস্যাঃ সন্তুষ্টা স্বল্পভোজনে।
আত্মভাবা চ সর্ব্বেষু গুরুভক্তি-পরায়ণা ॥
দেবপূজারতা সাধ্বী দ্বিজসেবা-পরায়ণা।
মধ্যমা রমণী সৈব সর্ব্বশাস্ত্রেষু কীর্ত্তিতা ॥

অধমা কুমারীর লক্ষণ

এতক্ষণ মহাদেব উত্তমা ও মধ্যমা কুমারীর যে বিবরণ দিলেন তা হলো সুলক্ষণযুক্ত। ঐ সব লক্ষণযুক্ত নারীকে বিবাহ করলে মঙ্গল হয়ে থাকে।

এবারে তিনি অধমা কুমারীর লক্ষণ বর্ণনা করতে লাগলেন। অধমা কুমারীর লক্ষণগুলি যে নারীর থাকে, তাকে বিবাহ করলে জীবন বিষবৎ হয়, দাম্পত্য জীবন কখনও সুখমন্ডিত হতে পারে না।

এই নারীর হস্তপদ ক্ষীণ হয়, কিন্তু দেহ তার তুলনায় মোটা হয়—বিশেষ করে দেহের মধ্যদেশ অর্থাৎ মাঝের অংশ মোটা হয়। এদের চোখ অর্থাৎ চোখের তারা কালো না হয়ে পিঙ্গলবর্ণ হয়ে থাকে। এদের দেহে বহু লোম থাকে, দাঁত খুব কম থাকে বা ফাঁক ফাঁক হয়ে থাকে। এরা কুদর্শন হয়। এরা অত্যন্ত উচ্চস্বরে হাসে। এরা বাচাল বা প্রগল্ভা হয়—অতিরিক্ত বেশি কথাবার্তা বলে সকলের বিরক্তি উৎপাদন করে।

এদের পেট মোটা হয়। সুমিষ্ট কথা এরা কখনও বলে না বা ভুলেও মিষ্ট কথা মুখ দিয়ে বের হয় না। এদের স্বর হয় কর্কশ। এরা নির্লজ্জের মত কথাবার্তা বলে.

মন সর্বদাই বিকল থাকে—কথাবার্তার মধ্য থেকে রোগের ভাব সব সময় ফুটে ওঠে। কাউকে এরা গ্রাহ্য করতে চায় না।

এদের হাত পা লম্বা হয়, চুল হয় ছোট ছোট। তা ছাড়া আগে বর্ণিত কুলক্ষণ কিছু কিছু এদের মধ্যে থাকে।

এদের লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত চালচলন কখনও দেখা যায় না। ধর্ম বা শাস্ত্রমত আচার আচরণ করতে এরা ভালবাসে না। নিজের ধর্মমত ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করতে পর্যন্ত এরা কুণ্ঠিত হয় না।

এই ধরনের কুলক্ষণযুক্ত নারী যে গৃহে বাস করে, সেখানে কখনও লক্ষ্মীর আগমন হতে পারে না।

এই সব লক্ষণ দেখেও যে লোক এই ধরনের মেয়েকে বিবাহ করে তারা সারা জীবন চরম দুঃখ ভোগ করে থাকে।

হে দেবি, তোমাকে এই ভাবে তিন প্রকার কুমারীর বিষয়েই বর্ণনা করে শোনালাম। এবারে বল তুমি আর কি কি কথা শুনতে ইচ্ছা কর?

অধমা যা কুমারী চ শৃণু তস্যা হি লক্ষণং।
ক্ষীণপাদকরা চৈব বহুলোমাক্ষিপিঙ্গলা ॥
সুদীর্ঘদর্শনা চৈব তথা বিরলদন্তিকা।
উচ্চাহাসা চা বাচালা কর্কশাঙ্গী মহোদরী ॥
নির্লজ্জা ক্রোধপূর্ণা চ সদা বিকলমানসা।
দীর্ঘপদকার চৈব খর্ব্বকেশা কুলক্ষণা ॥
স্বাচারবিহীনা যা তু পরিত্যজ্যাধমা মতা।
যদ্‌গৃহে নিবসেৎ সা চ তত্র লক্ষ্মীর্নগচ্ছতি ॥
পতিস্তস্যা ভবেদ্‌দুঃখী নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
কীর্ত্তিতং ত্বব দেবেশি কুমারীত্রয়লক্ষণং।
বদ দেবি মহাভাগে কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

মহাদেব এই ভাবে তিন শ্রেণীর কুমারী বিভাগের লক্ষণ বর্ণনা করলেন।

প্রত্যক্ষ জীবনে আমাদের এ বিষয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, তা হলো—বাস্তবে সব কটি লক্ষণ হয়ত একই নারীর মধ্যে দেখা যায় না।

কিন্তু মোটামুটি কুলক্ষণ বেশি যার মধ্যে দেখা যাবে, তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। সুলক্ষণ যার মধ্যে বেশি থাকবে, তাকেই গ্রহণ করতে হবে।

উদাহরণ ঃ

(১) ধরা যাক্, রমেনবাবু নামক এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলের বিবাহের জন্য মেয়ে দেখতে গেলেন।

সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, মেয়েটি ধার্মিক অর্থাৎ ধর্মে তার মতি আছে, সুশীলা, কখনও চীৎকার করে কথাবার্তা বলে না, দেহ মোটামুটি ভাল গঠনের, শরীরের কোন খুঁত নাই, কথাবার্তা বেশ সুমিষ্ট, সুদন্তা, দীর্ঘকেশী, কিন্তু মেয়েটির গায়ে হয়ত একটু লোম বেশি আছে।

এখানে সব সুলক্ষণের সঙ্গে মাত্র একটি কুলক্ষণ দেখে তিনি পাত্রীকে মনোনীত করতে পারেন।

(২) এবারে হয়ত বিনয়বাবু নামে এক ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র আদরের ভাগ্নের জন্য মেয়ে দেখতে গেলেন।

ভাগ্নেকে তিনি পরম যত্নে মানুষ করেছেন। সে ভাল চাকুরী করে—চরিত্রও ভাল।

মেয়ে দেখতে গিয়ে তিনি দেখলেন, মেয়েটির গড়ন মোটামুটি ভাল, কথাবার্তা মিষ্ট, মেয়েটি অধার্মিক নয় (যতটা বোঝা গেল)। কিন্তু তার চোখ ট্যারা, দাঁত ফাঁক ফাঁক, পায়ে প্রচুর লোম আছে, গায়ের ত্বক মসৃণ নয় (খসখসে)।

এখানে সুলক্ষণ কম এবং তাও ঠিক ধরা যায় না। কিন্তু অনেকগুলি কুলক্ষণ বর্তমান।

অথচ তার ভাগ্নে সুশীল, সুবোধ, শান্ত, জ্ঞানী ও ধার্মিক।

তাই তিনি মেয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলেন না এবং পরে কৌশলে সে সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

এইভাবে রতিশাস্ত্র মতে যোগ্যা-অযোগ্যা কুমারী নির্ণয় করে বিবাহাদি করলে জীবন আনন্দে ভরে ওঠে এবং বিবাহিত জীবন সুখময় হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যদি ভাল জ্যোতিষী পণ্ডিতকে মেয়ে দেখার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবার সুবিধা না থাকে, তবে মহাদেব-উক্ত এই রতিশাস্ত্রসম্মত বিধান বিচার করে কুমারী দেখলে তাতে সর্বদা সুফলই আশা করা যায়।

অবশ্য এ ছাড়া বিবাহে বিচার্য আরও বিষয় আছে—যেমন সতী অসতী নির্ণয়, জারজ নির্ণয় ইত্যাদি। এ বিষয়েও পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রতিশাস্ত্রসম্মত আলোচনা এ বিষয়গুলিকে প্রাঞ্জল ও সহজ করে তুলেছে সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুরুষ জাতির বিভিন্ন লক্ষণ ও চিহ্ন বর্ণনা

নারীর লক্ষণ-অলক্ষণের বিচার যেমন করা হলো, তেমনি আবার পুরুষ জাতির শরীরেও এমন সব চিহ্ন আছে যা দেখে তাদের সুখ বা দুঃখ কিংবা তাদের ভাগ্য কেমন হবে—তাদের জীবনে উন্নতি সম্ভব হবে না অবনতি ঘটবে তা বলা যায়।

অনেকে আজকাল হয়ত এ সব চিহ্নে বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু ধীরে ধীরে জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা ঘটতে থাকলে তাঁরা এ সব বিশ্বাস করতে বাধ্য হন।

পুরুষ বা নারীর হয়ত বিরাট উচ্চকূলে জন্ম—কিন্তু তারা তাদের দেহের বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী ভাগ্য লাভ করে।

তাই লক্ষপতির ঘরে জন্ম নিলেও কত লোক—যারা নানান ধরনের কুলক্ষণযুক্ত—তারা ধীরে ধীরে সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করে জীবনে অশেষ কষ্ট পায়।

আবার হয়ত কোন লোক খুব গরীব বা মধ্যবিত্ত ঘরে তার জন্ম, সে নিজের চেষ্টায়, উদ্যমে, ভাগ্যে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে ধনে, মানে, প্রতিষ্ঠায় সমাজে শ্রেষ্ঠ লোক বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে।

তাই কোন লোক তার মেয়ের বিবাহাদির জন্য যদি পাত্র খুঁজতে যায়, তবে শুধু বংশ বা চেহারা দেখে বিচার করলেই হবে না, পুরুষ জাতির নানা কুচিহ্ন তার দেহে বর্তমান কিনা তা দেখা একান্ত আবশ্যক।

আমরা জানি, স্বদেশে ও বিদেশে এমন হাজার হাজার লোক ছিলেন যাঁরা নিতান্ত গরীব হয়েও জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হয়েছেন।

সেক্সপীয়র ছিলেন ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান, ষ্ট্যালিন ছিলেন কামারের ছেলে, হিটলার মুচির ছেলে, মোঁপাসা পতিতার পুত্র। আমাদের দেশেও শরৎচন্দ্র, আলামোহন দাস, স্যার জেমসেদজী টাটা, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অজস্র মনীষী ও শ্রেষ্ঠ ধনী নিতান্ত গরীবের ঘরে জন্মেছিলেন।

তাই ভাগ্য বা সুখ সৌভাগ্যের পরিবর্তনে মানুষের বিশ্বাসী হওয়া অবশ্যই উচিত।

আমাদের শাস্ত্রে আরও আছে—

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং।
দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ ॥

কোন্ পুরুষের ভাগ্যে যে কি আছে, তা দেবতারা পর্যন্ত জানতে বা বলতে পারেন না। তাই সুখ-দুঃখ-সৌভাগ্য ইত্যাদির চিহ্ন যে অনেকটা এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে শুভ সূচনা করে সে কথা অবশ্য স্বীকার্য।

মহাদেব অতঃপর পুরুষজাতির সুখদুঃখের যে বর্ণনা দিলেন তা একে একে বলা হচ্ছে।

যে লোকের কণ্ঠস্বর, বুদ্ধি ও নাভি গভীর হয় তাকে সুখী ও সুলক্ষণযুক্ত বলে জানবে। অর্থাৎ সে লোকের গলার স্বর বেশ ভারী হয়, বুদ্ধি বেশ ধীরস্থির এবং বেশ ভালভাবে অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে সে কোনও কাজ করে না, আর তার নাভির গর্ত বেশ গভীর থাকে।

এ ছাড়া যার বুক, শির ও ললাট (কপাল) প্রশস্ত, সেও লক্ষ্মীবান পুরুষ বলে বর্ণিত হয়েছে।

স্বরো বুদ্ধিশ্চ নাভিশ্চ ত্রিগম্ভীরমুদাহৃতম্।
এবত্তূ যস্য বিস্তীর্ণং তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী।
উরঃ শিরো ললাটঞ্চ ত্রিবিস্তীর্ণং প্রশস্যতে ॥

তারপর অন্য আরও কতকগুলি লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে।

যে পুরুষের কটিদেশ বিশাল (বেশ চওড়া যার কোমর ও নিতম্ব), সে বহু পুত্র লাভ করে থাকে।

যে পুরুষের বাহু সুদীর্ঘ (অনেক সময় আজানুলম্বিত বলে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের বর্ণনা করা হয়), সে নরশ্রেষ্ঠ ও সুখ সম্পন্ন হয়ে পরম শান্তি ও আনন্দে দিন কাটাতে পারে।

যে পুরুষের বক্ষদেশ বিশাল—অর্থাৎ যার বুক বেশ চওড়া ধরনের সে পুরুষ ধনধান্যযুক্ত হন। সাংসারিক সর্ববিষয়ে তাঁর ভাগ্য ভাল দেখা যায়।

যে পুরুষের শিরোদেশ বিশাল (অর্থাৎ মাথা যার বড়), সে নরলোকে সর্বত্র পূজা পায়। এই পুরুষরা সর্বত্র সুমেধা ও নিজ কীর্তির মহত্বের জন্যে সকলের কাছে পুজনীয় হয় এবং সকলেই তাদের গুণের জন্য তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি করেন।

কটির্বিশালা বহুপুত্রভাগী
বিশালহস্তো নর-পুঙ্গবঃ স্যাৎ।
উরো বিশালং ধনধান্যভোগী
শিরো বিশালং নবপূজিতঃ স্যাৎ ॥

অতঃপরে আরও কতকগুলি পুরুষজাতির লক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে। এগুলি সব সুচিহ্ন।

যে পুরুষ বিশেষ কঠিন কাজকর্ম করে না, অথচ তার হাতদুটি হয় শক্ত ও কঠোর, অনেক পথ চলেও যার পা দুটি থাকে কোমল, আর যে পুরুষের করতল

রক্তবর্ণ অর্থাৎ লালচে রঙের হয়, সেই পুরুষ যে সুখী হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অকর্ম্মকঠিনৌ হস্তৌ পাদাবঙ্কনি কোমলৌ।
যস্য পাণিতলৌ রক্তৌ স সুখী নাত্র সংশয়ঃ ॥

যে পুরুষের শিশ্নাগ্র অর্থাৎ লিঙ্গের অগ্রভাগ স্থূল হয় সে সুখী হয়, যে পুরুষের শিশ্ন দীর্ঘ বা অনেক বেশী লম্বা সে দুঃখ পায়, যে পুরুষের শিশ্ন ছোট কিন্তু কৃশ হয় সে সৌভাগ্য লাভ করে থাকে।

স্থূলশিশ্নঃ সুখী চৈব দীর্ঘাশিশ্নশ্চ দুঃখিত।
কৃশশিশ্নশ্চ সৌভাগ্যলক্ষণং নাত্র সংশয়ঃ ॥

যে পুরুষের নেত্র (চোখদুটি) স্নিগ্ধ—অর্থাৎ যার দুটি চোখের দৃষ্টি কোমল ও সুন্দর, সে সুখ ও সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকে।

যে পুরুষের দন্ত স্নিগ্ধ অর্থাৎ চকচকে ও সুন্দরভাবে সাজান সে উত্তম খাদ্য ভোজন করে থাকে।

যে পুরুষের হস্ত স্নিগ্ধ অর্থাৎ যার হাত সুঠাম ও সুদৃশ্য হয় সে ঐশ্বর্যশালী হয়ে থাকে।

যে পুরুষের পদদ্বয় স্নিগ্ধ অর্থাৎ যার দুটি পা সুঠাম, কোমল ও সুদর্শন, সে নানা যানবাহনের অধিকারী হয়ে থাকে।

সৌভাগ্যং লভতে নূনঃ নেত্রস্নেহ-সমান্বিতঃ।
উত্তমং ভোজনং চৈব দন্ত-স্নেহ-যুতশ্চ হি।
হস্তস্নেহেন চৈশ্বর্য্যং পাদস্নেহেন বাহনম ॥

এবারে সবচেয়ে সুখ ঐশ্বর্য্য ও সম্পদযুক্ত পুরুষের একটি বিশেষ লক্ষণ এখানে বলা হচ্ছে।

দুটি ভ্রূর মধ্যে কপালে যদি কোনও পুরুষের রক্তবর্ণ অর্থাৎ লাল রঙের রেখা থাকে, তবে সে সর্ব ঐশ্বর্যযুক্ত ও অতুলনীয় সুখের অধিকারী হয়ে থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে তেমন পুরুষের মত সুখ ও ঐশ্বর্য্য একাধারে কেউ উপভোগ করতে পারে না। এই চিহ্ন অত্যন্ত সুলক্ষণযুক্ত।

কিন্তু এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ঐ রেখাটি সম্পূর্ণ নিচের থেকে ওপর পর্যন্ত আগাগোড়া লালবর্ণ হতে হবে।

যদি তা না হয়ে এই রেখার উপরের দিকের কিছুটা অংশ নীলবর্ণ হয় বা নীল আভা বের হয়, তাহলে সে পুরুষ জীবনে কখনও সুখলাভ করে না।

ভ্রুবোর্মধ্যে চ যা রেখা রক্তবর্ণা ভবেদ্যদি।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমাযুক্তঃ স সুখী নাত্র সংশয়ঃ ॥

তস্যোর্দ্ধে যদি রেখা স্যাৎ নীলবর্ণা চ দীর্ঘিকা।
ন সুখং লভতে ক্কাপি ইতি শাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥

মহাদেব অতঃপর রতিশাস্ত্রে সুখদুঃখের আরও নানা চিহ্ন একে একে বর্ণনা করে চললেন।

যদি কোন পুরুষের নাকের অগ্রভাগে বর্তুলাকার (বোতলের মত গোল) চিহ্ন থাকে এবং সেই চিহ্ন যদি কিছু শুক্ল অর্থাৎ সাদা রঙের আভাযুক্ত হয় তাহলে সেই পুরুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন পরম সুখে দিন যাপন করে।

জীবনে কখনও কোনও অভাব বা অশান্তি এসে তাদের ক্লেশ দিতে পারে না।

যে লোকের কপালে শুক্লরেখা অর্থাৎ সাদা রঙের রেখা দেখা যায় সেই পুরুষ আজীবন সুখে দিন কাটায়—জীবনে কখনও কষ্ট পায় না। কামশাস্ত্রে এইসব সুলক্ষণগুলি যা লেখা আছে তা কখনও মিথ্যা হয় না।

বার্তুলাকারচিহ্নঞ্চ নাসাগ্রে যদি দৃশ্যতে।
কিঞ্চিৎ শুক্লঞ্চ তচ্চিহ্নঞ্চ সুখী নাত্র সংশয় ॥
ললাটে যদি জায়তে শুক্লরেখা নরস্য চ।
সুখিনং তং বিজানীয়াৎ কথিতং কামশাস্ত্রিণা ॥

এতক্ষণ ধরে মহাদেব পুরুষের সুখ, সৌভাগ্যের কতকগুলি রেখা বর্ণনা করলেন। এবারে তিনি এমন কতকগুলি চিহ্ন বর্ণনা করলেন, যা থাকলে মানুষ জীবনভর দুঃখভোগ করে থাকে।

যে পুরুষের চোখের উপর অর্থাৎ চোখের উপরের পাতার উপরিভাগে গৌরবর্ণ রেখা দেখা যায়, নিঃসংশয়ে সে পুরুষ আজীবন দুঃখভোগ করবে।

যে পুরুষের নাসামূলে অর্থাৎ গোড়ার দিকে পীতবর্ণ অর্থাৎ হল্‌দে রঙের চিহ্ন দেখা যায়, সে আজীবন দুঃখভোগ করে এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

গৌররূপা চ যা রেখা যদি স্যাৎ নেত্রসংস্থিতা।
দুঃখভোগী ভবেচ্চৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
নাসামূলে চ যৎ চিহ্নং দৃশ্যতে পীতবর্ণকম্‌
তচ্চ দুঃখস্য মূলং স্যাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

এ ছাড়া যদি কোন পুরুষের অধরে অর্থাৎ ঠোঁটে অরুণবর্ণ অর্থাৎ টকটকে লাল চিহ্ন থাকে, তবে তারা সারা জীবন দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে থাকে।

যদি কোনও পুরুষের অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখা যায় তাহলে সেই পুরুষ যতদিন জীবিত থাকে, দুঃখে শোকে তার কাল অতিবাহিত হয়ে থাকে।

যদি কোনও পুরুষের করতলে মৎস্যপুচ্ছের চিহ্ন থাকে—সেই চিহ্ন সুখ ও ধর্মময় জীবনের লক্ষণ। কিন্তু সেই মৎস্যপুচ্ছের নিম্নভাগে বর্তুলাকার ধূম্রবর্ণ চিহ্ন

থাকলে সেটি খুব খারাপ। যতদিন সে বেঁচে থাকে খুব দুঃখে তার দিন অতিবাহিত হয়।

যদি স্যাদারুণং বর্ণং চিহ্নং কস্যাপি চাধরে।
তদা তস্য বিজানীয়াৎ জীবনং দুঃখমূলকম্ ॥
অঙ্গুষ্ঠমূলমধ্যে যা রেখা স্যাৎ কৃষ্ণবর্ণিকা।
দুঃখমূলং হি তস্য স্যাৎ জীবনং নাত্র সংশয় ॥
মীনপুচ্ছসমীপে চ যস্য চিহ্নং ব্রজত্যধঃ।
বক্রাকৃতিঃ ধূম্রবর্ণং দুঃখেন তস্য জীবনম্ ॥

যদি কোন পুরুষের তর্জনীর অগ্রভাগে অর্থাৎ তর্জনীর আগায় গোলাকার চিহ্ন দেখা যায় তাহলে সে কখনো সুখে কখনও বা দুঃখে দিনযাপন করে। তার জীবন মধ্যম ধরনের হয়।

তর্জ্জন্যগ্রে চ যা রেখা গোলাকারা ভবেদ্‌যদি।
সুখং দুঃখং বিজানীয়াৎ মধ্যমং জীবনং ধ্রুবম্ ॥

যে পুরুষের হাতে অনামিকা ও মধ্যমা এই দুটি আঙুলের মধ্যের পর্বে যদি দীর্ঘাকৃতি কোনও রেখা বা চিহ্ন আদি দেখা যায়, আর সেই রেখা বা চিহ্ন যদি চিক্কণ অর্থাৎ সরু হয়, তাহলে সেই পুরুষ আজীবন পরম সুখে দিনযাপন করে।

এছাড়া আয়ুরেখার পাশে যদি কোনও পীতবর্ণ চিহ্ন বা লম্বালম্বি কোনও রেখা (পীতবর্ণ) দেখা যায় তাহলে তা শুভ লক্ষণ বলে জানবে। সে পুরুষ যতদিন জীবিত থাকবে পরম সুখে তার দিন কাটবে।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক।

রতিশাস্ত্র মতে আয়ুরেখা বলতে আমাদের ভারতীয় মতে যে আয়ুরেখা, তাই বোঝাবে—অর্থাৎ কনিষ্ঠার মূলের একটু নিচে থেকে তর্জনীর দিকে যে রেখা গেছে সেই রেখা। পাশ্চাত্য মতে ওকে হৃদয়রেখা বলে। পাশ্চাত্য বা কিরোর মতে আয়ুরেখা তর্জনীর কিছু নীচে থেকে মণিবন্ধের দিকে নেমে এসেছে, এই গ্রন্থে তাকে আয়ুরেখা ধরা হয়নি।

যস্য পাণিতলে চিহ্ন মধ্যমানামপর্ব্বণোঃ।
সুদীর্ঘাকৃতিকং স্নিগ্ধং সুখং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ।
আয়ুঃসমীপগা রেখা যদি স্যাৎ পীতবর্ণিকা।
শুভ সা কথিতা চৈব সুখমূলং হি জীবনম্ ॥

এবারে হাতের রেখার মধ্যে আরও কয়েকটি প্রধান প্রধান রেখার কথা বলা হচ্ছে—যে সব রেখা পুরুষের করতলে তারা পরম সুখে সারা জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

যদি কোনও পুরুষের হাতে পদ্মচিহ্ন, তোরণচিহ্ন অথবা ধনুচিহ্ন থাকে তবে সেই পুরুষ পরম সুখে দিন কাটায় বলে শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ দিয়েছেন।

এই তিনটি রেখার যে কোনও একটি থাকলে মোটামুটি সুখী হয়—তিনটি রেখা বা দুটি রেখা একত্রে থাকলে সে সারা জীবন পরম আনন্দে ও সুখে জীবন অকিবাহিত করে।

পঙ্কজং তোরণং পাণৌ ধনুর্ব্বা দৃশ্যতে যদি।
সুখং তস্য বিজানীয়াৎ ইতি শাস্ত্রবিদাং মতম্॥

এবারে হৃদয়রেখা বা ভারতীয় মতে আয়ুরেখা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

পুরুষের হাতে কনিষ্ঠা থেকে যে রেখা তর্জনীর দিকে দেখা যায়, সে রেখা যদি কোনস্থানে ছিন্ন বা কর্তিত না হয়, তবে সেই পুরুষ সুখে পূর্ণ হয়ে আনন্দময় জীবন যাপন করে। সে জীবনে কখনও দুঃখ অনুভব করে না—বিবিধ ঐশ্বর্য্যে তার ঘর সর্বদা পূর্ণ থাকে।

কনিষ্ঠাত্তর্জ্জনীং যাবৎ রেখা ভবতি চাক্ষতা।
স সুখী সুখভোগী চ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতম্॥

এবারে পুরুষের করতলের আর একটি প্রধান রেখার বর্ণনা করা হচ্ছে।

পুরুষের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির গর্ভে অর্থাৎ বৃদ্ধা অঙ্গুলির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় যদি যবচিহ্ন বা যবের মত আকৃতির চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়ে পরম সুখে দিন কাটায়।

জীবনে কোনও দিন সে দুঃখ পায় না বা দুঃখ হলেও তার জীবনে স্থায়ী হতে পারে না।

অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু যবো যস্য বিরাজতে।
উন্নতং শোভনং তস্য জীবনং নাত্র সংশয়ঃ॥

এবারে একটা কথা আলোচনা করা আবশ্যক। তা হলো, যদি কোনও পুরুষের সুখ ও দুঃখের চিহ্ন একত্র দেখা যায়, তাদের ভাগ্যে কি হবে?

যদি সুখের ও দুঃখের চিহ্ন সমান হয় তবে মাঝামাঝি জীবন কাটাবে, সুখের চিহ্ন বেশী হলে সে সুখ ভোগ করবে। এই নিয়মেই সুখদুঃখের বিচার করা হয়ে থাকে।

যে পুরুষের হাতের চেটোয় (করতলে) তুলা বা দাঁড়িপাল্লা মীন বা ঐ ধরনের মৎস্যাকার রেখা ও বজ্র-আকারের রেখা থাকে, সে ব্যবসায়ে প্রচুর সাফল্য লাভ করে। প্রচুর অর্থ সে সারা জীবনে উপার্জন করে থাকে। সে ধনী হয়—অনেক পুত্রকন্যাসহ পরম সুখে কাল কাটায়।

এ বিষয়ে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তিনটি চিহ্ন একত্রে থাকলে সম্পূর্ণ ফললাভ করবে। দুটি থাকলে আংশিক এবং যে কোনও একটি থাকলে সামান্য ফল পাবে।

মীন তুলা তথা বজ্রং করমধ্যে চ দৃস্যতে ॥
তস্য বাণিজ্যসিদ্ধিস্যাৎ পুরুযস্য ন ভবেৎ ধ্রুব।
ধনাঢ্যশ্চ স বিজ্ঞেয়ো বহুপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥

যে পুরুষের হাতের মধ্যে অঙ্কুশ, কুন্ডল কিংবা ছত্র বা ছাতার চিহ্ন দেখা যায় অর্থাৎ এই তিনটি চিহ্ন একত্র থাকলে সে রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি পায়। রাজার অনুগ্রহে সে দেশের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তি হতে পারে এবং পরম সুখে তার দিন কাটে। যদি দুটি মাত্র থাকে সে রাজতুল্য সুখী হবে। একটিতে রাজাধীনে সাধারণ চাকুরী দ্বারা সুখে জীবনধারণ করবে।

কুন্ডলং অঙ্কুশং ছত্রং যস্য হস্ততলে ভবেৎ।
তস্য রাজ্যং মহাশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রোক্তবচনং যথা ॥

যে পুরুষের হাতে পর্বত, কঙ্কণ বা কাঁকন, যোনি, নৃমুন্ড এবং ঘটাকৃতি চিহ্ন দেখা যায়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজার মন্ত্রী হয়ে থাকে। সব কটি চিহ্ন না থাকলেও কয়েকটি থাকলে, অন্ততঃ দুটি থাকলে মন্ত্রীর মত সম্মান পেয়ে থাকে। যদি কারও উৰ্দ্ধরেখা বা ভাগ্যরেখা হাতের মণিবন্ধ থেকে সোজা অনামিকা পর্যন্ত খাড়া উঠে যায়, সে ব্যবসায় দ্বারা অজস্র অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়। সে পুত্র পৌত্র প্রাপ্ত হয়ে পরম সুখে দিন কাটায়।

গিরি কঙ্কণযোনীনাং নরমন্ডঘটস্য চ।
করেবৈ যস্য চিহ্নানী রাজলক্ষ্মীঃ ভবেন্নরঃ ॥
অনামিকোৰ্দ্ধরেখায়াং ব্যবসায়ে ধনাগমঃ।
সুখেন জীবতে পুত্রপৌত্রগৃহাদিমান্ নরঃ ॥

যে পুরুষের অনামিকায় চক্রচিহ্ন থাকে সে নানা উপায়ে কিংবা বন্ধু দ্বারা অর্থ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি তা না থেকে বিপরীত কোনও চিহ্ন থাকে (যেমন ক্রুশ বা কালো তিল) তার নানা বিষয়ে অর্থ ক্ষয় হয়ে থাকে।

চক্রশ্চ অনামিকায়াংসর্ব্বদ্বারা ধনং লভেৎ।
তস্য বিপরীতে তু এব ব্যয়োভবতি নিশ্চিতম্ ॥

এবারে করতল বর্ণনা শেষ করে মহাদেব পদতল সম্বন্ধে কয়েকটি চিহ্ন পার্বতীর কাছে বর্ণনা করলেন।

যে পুরুষের পদতলে কমল বা পদ্ম, তড়াগ বা পুকুর, অঙ্কুশ অথবা বজ্রচিহ্ন অংকিত থাকে, সে ব্যক্তি খুব ভাগ্যবান। সে প্রচুর ধনের অধিকারী হয় এবং রাজার মত সম্মান লাভ করে থাকে। এমন কি সবগুলি চিহ্ন থাকলে সে রাজা হতেও পারে।

পদ্মং চক্রং তড়াগ-অঙ্কুশং বাপি তোরণং।
বজ্রং যস্য পাদতলে স রাজা ভবতি ধ্রুবম্ ॥

যার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের মূল থেকে চরণের তল পর্যন্ত বিস্তৃত রেখা দেখা যায় সে নিঃসংশয়ে রাজা হয় এবং প্রচুর ধনসম্পদ নিষ্কন্টকে ভোগ করে।

যস্য বৃদ্ধাঙ্গুলের্মুলাৎ রেবা পাদে চ দৃশ্যতে।
রাজ্যং লভতে ধ্রুবম্ ভুঙ্ক্তে বিকন্টকাং মহীম্ ॥

যে পুরুষের দুটি পা অনেক শিরাযুক্ত, কুটিল, রুক্ষ, পায়ের পিঠ অর্থাৎ উপরের অংশ সূর্পের মত বড়, নখগুলি পাণ্ডুর বর্ণ এবং আঙ্গুল বিবর্ণ ও সরু সরু, সে ব্যক্তি অতি অবশ্যই দরিদ্র হয়।

বক্রৌসূর্পাকারৌ চ বিরুক্ষৌ পাদৌ শিরালকে।
সংশুষ্কৌ পাণ্ডুরনখী নিঃস্বস্য বিরলাঙ্গুলী ॥

যে পুরুষের দুটি চরণতল মৃদু বা নরম, কমল উদরের মত অর্থাৎ পদ্মফুলের মত কোমল, অঙ্গুলীগুলি মনোহর, নখগুলি লালচে রঙের, চরণের পিঠে অর্থাৎ উপরের অংশ কূর্মপৃষ্ঠের মত অর্থাৎ কচ্ছপের পিঠের মত সুগোল, উন্নত, সে নিশ্চয়ই রাজপদ বা উচ্চপদ পায় এবং পরম সুখের মধ্যে তার দিন কাটে।

মৃদুতলৌ কমলোদর সন্নিভৌ শ্লিষ্টাঙ্গুলী তাম্রনখৌ।
শিরোজঝিতৌ কূর্মোন্নতৌ সুপাঞ্চীঃ নৃপতেঃ স্মৃতৌ

যে পুরুষের দুটি জানু ও উরুদেশ পরস্পর সমান ও আয়ত থাকে, সে নিঃসন্দেহে রাজপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির জানু কৃশ বা রোগা হয় সে অল্পভোগ্য হয়—সে জীবনে প্রচুর পরিশ্রম করেও যথেষ্ট উন্নতি করতে পারে না।

যে লোকের জানু নিম্ন অর্থাৎ পেছনের দিকে একটু বাঁকানো এবং উপরের দিকে ফোলা নয়, সে স্ত্রীরত অর্থাৎ স্ত্রৈণ হয়। যার জানু দেখতে বিকট-আকার সে দরিদ্র হয়, আর যার জানু মাংসল সে অতি অবশ্য ধনবান হয়ে থাকে।

উরবো জানবঃ তুল্য নৃপস্যোগচিতাঃ স্মৃতাঃ।
নির্মাংসজানুঃ সৌভাগ্যমল্পঃ নিম্নেরতঃ স্ত্রিয়াঃ।
বিকটৈশ্চ দরিদ্রাঃ স্যুঃ সমাংসৈরাঢ্য এব চ ॥

যে পুরুষের জঙ্ঘা অল্প অল্প লোমে পরিপূর্ণ, যেটি হাতীর শুঁড়ের মত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়ে সরলভাবে নেমে আসে, জঙ্ঘার প্রত্যেক রোমবিবর বা লোমকূপে মাত্র একটি লোম থাকে, সেই লোক নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ লক্ষণযুক্ত ও পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। রাজা বা মহাপুরুষ ব্যক্তিদের জঙ্ঘা এই ধরনের হয়ে থাকে।

হস্তিকরোপমা জঙ্ঘা শ্রেষ্ঠ অল্পরোমযুতা।
রোমৈকৈকং কূপকে স্যাৎ ভূপানান্ত মহাত্মকাম্ ॥

যে পুরুষের কোমর (কটিদেশ) সিংহের কোমরের মত অর্থাৎ ওপরে ও নিচে দুদিকে চওড়া হয়ে উঠে গেছে, কিন্তু মাঝখানে সরু, সে লোক নিঃসন্দেহে পরম সুখী হয় এবং রাজার কৃপা বা রাজপদ পায়।

কিন্তু যে লোকের কোমর সরু কিন্তু আগাগোড়া লম্বালম্বি সরু হয় উঠে গেছে অর্থাৎ তা কপির (বানরের) কোমরের মত, সে লোক দরিদ্র হয়। যার নাভি দক্ষিণাবর্তী ও গভীর, সে রাজতুল্য সম্মান পায়।

ভবেৎ সিংহ কটি রাজা নিঃস্ব কপিকটির্নরঃ।
নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্তী গভীরাজতুলা শুভা ॥

যে লোকের পেটে একটিমাত্র বলী থাকে (মাংসল উঁচু পিন্ড) সে ব্যক্তি শত বৎসর পরমায়ু পায়। যার বলী দুটি, সে ব্যক্তি স্ত্রীভোগী হয়। আর যার পেটে তিনটি বলী দেখা যায়, সে নরপতি কিংবা অধ্যাপক বা আচার্য (জ্ঞানী ও সুখী) হয়।

যার পেটের তিনটি বা দুটি বলী সোজা বা সরল হয়, সে পরম সুখী হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তির পেটে বলিরেখা চক্রাকার অর্থাৎ গোল, সে অগম্যা নারীতে সমাযুক্ত হয়। আর যে সব লোকের দুটি পাশ স্থূল অর্থাৎ মোটা এবং মাংসল, তারা রাজতুল্য সুখী হয় কিংবা নৃপতি বা রাজচক্রবর্তী পদ প্রাপ্ত হয়।

একবলিঃ শতায়ু স্যাং স্ত্রীভোগী দ্বিবলী স্মৃতঃ।
ত্রিবলিঃ জ্ঞানী আচার্য ঋজুভির্ব্বলিভিঃ সুখী।
অগম্যাগামী চক্রবলি ভূপাঃ পার্শ্বেশ্চ মাংসলৈঃ ॥

যে লোকের পিঠের পার্শ্বদেশ বেশ বিস্তৃত, সে ধনী হয়—যার পার্শ্বদেশ নিম্ন ও লাল রঙের, সে নিঃস্ব হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তির কাঁধ বৃষ বা হস্তীর কাঁধের মত, কিংবা কলাগাছের মত সংবদ্ধ ও উন্নত, সে মহাভাগ্যবান লোক হয়। সে বহু লোকের কাছ থেকে সম্মান পায় এবং রাজার মত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে।

ধনিনো বিপুলৈঃ পার্শ্বৈঃ নিঃস্বা রক্তৈশ্চ নিম্নগৈ
বৃষস্কন্ধো গজস্কন্ধঃ কদলীস্কন্ধঃ এব চ।
মহাভাগো মহাধন্যঃ স সর্ব্ব পার্থিবোপম্ ॥

যে লোকের মাথা অর্থাৎ শির ছাতার মত আকৃতিবিশিষ্ট (ছত্রাকৃতি) সে রাজার মত সুখী, ধনবান ও কল্যাণাস্পদ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির মাথা শিরাযুক্ত, উঁচু ও প্রশস্ত, সে নিশ্চয়ই রাজা হবে।

কিন্তু যার শির ঘটাকৃতি বা ঘটের মত সংকীর্ণ, সে পাপাত্মা ও ধনহীন বা গরীব হয়ে থাকে।

ছত্রাকারৈঃ শিরোভিস্তু নৃপঃ শিবময়ো ধনী।
শিরালমুন্নতং নৃপ প্রশস্তশ্চ শিরো যদি।
ঘটমূর্দ্ধা পাপরুচিধনাদ্যৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ ॥

এবারে মহাদেব মানুষের মুখাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করে দেবী পার্বতীকে শোনালেন।

মুখই মানুষের মনের পরিচয়। মুখের চেহারা দেখে কে কেমন লোক কার চরিত্র ভাল, কে মন্দ তা অনেকটা বোঝা যায়।

মহাদেব-উক্ত রতিশাস্ত্র অনুযায়ী—যে লোকের বদন ভয়ংকর বা ভয়াল অর্থাৎ দেখলে ভয় জাগে, সে নিশ্চয়ই দুঃখী ও ভাগ্যহীন হয়। যে লোক মেয়েদের মুখের মত কোমল মুখবিশিষ্ট, সে সুপুত্র লাভ করে সুখী হয়। যে লোকের মুখখানি বর্ত্তুলের মত গোল সে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। আর যাদের মুখ খুব লম্বা তারা দ্রব্যহীন বা বিষয়সম্পত্তিহীন হয়ে থাকে।

যে সব লোকের বদনমন্ডল পদ্মের মত বিকশিত, তারা ধনধান্য প্রভৃতি সম্পত্তির অধিকারী হয়। আর যার মুখে কখনও হাসি ফোটে না—মুখ গম্ভীর, সে দুঃখী ও দরিদ্র হয়।

মহাসুখং দুর্ভগানাং স্ত্রীমুখং পুত্রমাপ্নুয়াৎ।
আঢ্যানাং বর্ত্তুলং বক্তুং নির্দ্রব্যাণাঞ্চ দীর্ঘকম্ ॥
পদ্মবক্ত্রশ্চ পুরুষা ধনধান্যাদি ভোগিনঃ।
ন হাস্যবদনা যে তে দুঃখদারিদ্র্যভোগিনঃ ॥

যে লোকের নাক উন্নত সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়। আর যার নাকে তিল ও সরু লোম অনেক থাকে সে দুঃখী, গরীব ও দুশ্চরিত্র হয়। যার নাক শুক পাখির মত, সে উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। আর যাদের নাক তিলফুলের মত, তারা ভোগশীল হয়ে থাকে।

উচ্চনাসাশ্চ যে মর্ত্ত্যাস্তে সর্ব্বে জনবল্লভাঃ।
তিললোমসংযুক্তা নাসা দুঃখিতা ধর্ম্মশীলবর্জ্জিতাঃ।
পার্থিক শুকনাসাশ্চ তিলপুষ্পাশ্চ ভোগিনঃ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নারীদের সুখ দুঃখের লক্ষণ বর্ণনা

কি কি লক্ষণ পুরুষের দেহে থাকলে সে সুখী হয় আর কি কি লক্ষণ থাকলে সে দুঃখ পায়, এর আগে মহাদেব সে বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা করলেন।

এবারে নারীজাতির দেহে কি কি চিহ্ন থাকলে তারা সুখী হয় আর কি কি চিহ্নের ফলে তারা দুঃখ পায়, মহাদেব একে একে তার বর্ণনা করতে লাগলেন।

যে নারীর যোনি কূর্মপৃষ্ঠের মত (কচ্ছপের পিঠের মত) অথবা গজ স্কন্ধের (হাতীর কাঁধের) মত, সে যাবজ্জীবন পরম সুখে দিন কাটায়।

কচ্ছপের পিঠের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তার অর্থ—যদি ভগদেশ উচ্চ ও পুষ্ট হয় তাহলে তা দৃঢ়সংবদ্ধ ও উঁচু অর্থাৎ কচ্ছপের পিঠের মত দেখাবে নিশ্চয়ই। হাতীর কাঁধ আর কচ্ছপের পিঠ অনেকটা একই রকম দেখতে হয়।

এই ধরনের নারীরা পতিপরায়ণা হয় এবং দাম্পত্য জীবনে তারা সুখী হয়, ইহাই শাস্ত্রবচন।

মুত্রজঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠাভঃ করিস্কন্ধসমস্তথা।
স সুখভাগিনী যস্যাঃ রতিশাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতম্॥

নারীর কক্ষপ্রদেশ (অর্থাৎ তলপেট থেকে উরুর উপরি-ভাগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ) যদি অশ্বত্থপাতার মত আকৃতিবিশিষ্ট (অনেকটা পানের পাতার মত) হয় এবং তাতে উর্দ্ধ লোম (খোঁচা খোঁচা লোম) পূর্ণ হয়ে থাকে তবে সে নারী নিশ্চয়ই পরম সুখের অধিকারিণী হয়, এতে সন্দেহ নাই। সুধী অর্থাৎ মনীষী ব্যক্তিগণ সকলে রতিশাস্ত্র-সম্মত এই বিধান সমর্থন করে থাকেন।

কক্ষোঽশ্বত্থদলাকার উর্দ্ধলোমসমন্বিতা।
সুধীভিঃ কথিতা যস্যাঃ শুভা সা সুখভাগিনী॥

যে নারীর জঙ্ঘা দুটি সুন্দরভাবে গোলাকার, মসৃণ, সোজা আর লোমশূন্য হয়, আর সেই সঙ্গে দুটি জানু সমান হয় অর্থাৎ ছোট বড় বা পৃথক না হয়, সেই নারীর পরম সুখে দিন কাটতে থাকে।

সুবৃত্তে সরলে চৈব জঙ্ঘে লোমবিবর্জ্জিতে।
সমঞ্চ জানুযুগলং সা ভবেদ্‌সুখভাগিনী॥

এবারে পায়ের তলের কয়েকটি চিহ্ন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যে নারীর পায়ের তল পদ্মের মত অর্থাৎ কোমল, মসৃণ, গোলগাল এবং সুদর্শন, সে সুখের অধিকারিণী হয়। পায়ের সঙ্গে পদ্মের তুলনা রতিশাস্ত্রেই করা হয়েছে—অবশ্য হাতের সঙ্গে পদ্মের তুলনা অন্যান্য শাস্ত্রে করা হয়েছে।

পায়ের তলভাগে যদি বজ্রচিহ্ন হলচিহ্ন বা পদ্মচিহ্ন থাকে তবে তা খুবই শুভ। এরূপ চিহ্নবিশিষ্ট নারীকে উচ্চস্তরের নারী বলে জানতে হবে। নীচকূলে তাদের জন্ম হলেও তারা পরম সুখে দিন কাটাবে—এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। সে নারী রাজপত্নী হবার উপযুক্ত।

বজ্রাজ-হল চিহ্নঞ্চ মস্যাঃ পাদতলে স্থিতম্।
রাজপত্নী তু সা জ্ঞেয়া রাজভোগ-প্রদায়কম্ ॥

যে নারীর দাঁতগুলি চক্‌চকে সুন্দর সাজান, দাঁতের মধ্যে মধ্যে ফাঁক না থাকে অর্থাৎ দাঁতগুলি ঠিক কুন্দফুলের মত দেখায়, যার কণ্ঠের স্বর সুমিষ্ট (অর্থাৎ ঘ্যান ঘ্যানে নাকি সুর কিংবা কর্কশ স্বর যার কণ্ঠে বের হয় না)—কণ্ঠের স্বর ঠিক বাঁশীর ধ্বনির মত মিষ্ট ও মনোহর, সে নারী সুখভাগিনী হয়ে থাকে।

এছাড়া রতিশাস্ত্রে আরও লক্ষণ বর্ণনা করেছেন মহাদেব। নারীর বদনমন্ডল বেশি লম্বাটে, চোয়াড়ে বা গালভাঙা এগুলি ভাল চিহ্ন নয়, আবার ঠিক চাঁদের মত গোলও ভাল নয় (যদিও কবিরা চন্দ্রমুখী বলে নারীর উপমা দেন, কিন্তু রতিশাস্ত্রমতে তা সুলক্ষণ নয়)। যে নারীর বদনমন্ডল ঠিক বর্তুলাকার, সেটি খুব ভাল লক্ষণ।

বর্তুলাকার মোটামুটি গোল তবে একটু চাপা। অধর ওষ্ঠ নারীর বিম্বের মত টকটকে লাল হওয়া খুব ভাল রতিশাস্ত্রমতে।

নারীর দুটি নাকের ছিদ্র সমান হওয়া ভাল লক্ষণ—ছোট বড় হওয়া ভাল লক্ষণ নয়।

উপরে বর্ণিত সমস্ত লক্ষণ যে নারীর দেহে থাকে, সে পরম সুখে দিন কাটায়।

শাস্ত্রোক্ত ভাষায় ঃ

কুন্দপুষ্পসমা দন্তাঃ স্বরেণ বংশিকাসমা।
মুখং হি বর্ত্তুলং চৈব অধরৌ বিম্বসন্নিভৌ।
তথা সমপূর্য্য নাসা ভবেদ্ বৈ সুখভাগিনী।

যদি কোনও নারীর চক্ষুপল্লবের উপরে গৌরবর্ণ (সাদা) রেখা দেখা যায় তবে সে নারী দুঃখভাগিনী হয়ে থাকে, এতে কোনও সংশয় নেই।

গৌরবর্ণা চ যা রেখা যদি স্যাৎ নেত্রসংস্থিতা।
সা নারী দুঃখভাগিনী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

যে নারীর দুটি চোখ নীল উৎপলের মত (অর্থাৎ নীল রঙের পদ্মের মত) বিস্তৃত, এবং তার দুটি প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে, সে নারী যাবজ্জীবন সুখভোগ করে। পদ্মের মত চোখ অর্থাৎ টানা টানা চোখ যা খুললেও সম্পূর্ণ খোলে না—অনেকটা যাকে হরিণীনয়না বলে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে এরূপ চোখ সুলক্ষণযুক্ত।

এরূপ চোখ দুটি নাকের দু পাশের সঙ্গে সংলগ্ন হবে এবং টানা টানা হওয়ায় যেন আকর্ষণ বিস্তৃত বলে মনে হবে।

এমনি সুন্দর চোখের অধিকারিণী নারী প্রচুর বিদ্যা অর্জন করে এবং পরম সুখে দিন কাটায়।

নীলোৎপলনিভঃ চক্ষুর্নাসালগ্নং সলম্বকম্।
পৃথুলে বালেন্দুনিভে তাং বিদ্যা সুখভাগিনীম্।

যে নারীর চুলগুলি আপনা থেকেই তেল-ভেজানো চুলের মত মসৃণ, চিক্কন ও কোমল থাকে—অর্থাৎ তেলে না ভেজালেও তৈলাক্তের মত দেখায় এবং সেই চুলগুলি নীলবর্ণ ও কুঞ্চিত থাকে, সে রমণী চিরসুখ-ভাগিনী হয়—সেই নারীকে সব নারীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা বলা হয়ে থাকে। শাস্ত্রে তাকে রমণীশ্রেষ্ঠা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

স্নিগ্ধা নীলাশ্চ মৃদবো মুর্দ্ধজোঃ কুঞ্চিতাস্তথা।
ধ্রুবং সা রমণীশ্রেষ্ঠা চিরং সুখস্য ভাগিনী।

হাঁটবার সময়ে যে নারীর দুটি পায়ের কনিষ্ঠা আর অনামিকা এই দুটি আঙুল ভূমি স্পর্শ করে না, সেই নারীকে কুলটা বলে জানা উচিত। যে নারীর সারা জীবন ধরে নানা দুঃখ ভোগ করে থাকে।

কনিষ্ঠিকা গতৌ যস্যাঃ অথবানামিকাঙ্গুলিঃ।
ন স্পৃশতি ধরাং সৈব কুলটা দুঃভাগিনী।

যদি কোনও নারীর দুটি চোখ কেকরা অর্থাৎ ট্যারা হয়, সে নারীর স্বভাব প্রচন্ড অর্থাৎ তার কণ্ঠস্বর ব্যবহার ইত্যাদি তীব্র হয়ে থাকে। উগ্রভাবে সে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় এবং নানা লোকের নিন্দাভাগিনী হয়।

যদি কোনও নারীর গলা ছোট এবং স্থূল হয় তবে সে আজীবন মহাদুঃখ ভোগ করে জনসমাজে ঘুরে বেড়ায়। গলা স্থূল অর্থে ছোট এবং মোটা ঘাড়বিশিষ্ট গলা বোঝান হয়েছে। শাস্ত্রোক্ত ভাষায় ঃ

নয়নে কেকরে যস্যাঃ সা প্রচন্ডস্বভাবিকা।
স্থূলগন্ডাঃ চ যা নারী সা হি জীবনদুঃখিনী ॥

যদি নারী হাসলে তার গলা কূপ পড়ে অর্থাৎ টোল পড়ে তবে এটি অত্যন্ত কুলক্ষণ বলে জানতে হবে। টোল বা কূপ বলতে এখানে সামান্য খাঁজ নয়, গোলাকার গভীর গর্তকে কূপ বলা হয়ে থাকে।

এই শ্রেণীর নারীরা নিশ্চয়ই ব্যাভিচারিণী হয়। তারা যত দিন বেঁচে থাকে মহাকষ্টে দিন কাটায়।

হাসতে গডয়োশ্চৈব সীতে কূপে ভবিষ্যতঃ।
কুলটা সা ভবেন্নারী আজন্ম-দুঃখ-ভাগিনী ॥

নারীর হাতে অর্থাৎ করতলে কনিষ্ঠার নিচে থেকে তর্জনীর দিকে যে রেখাটি যায় অর্থাৎ যাকে রতিশাস্ত্র অনুযায়ী আয়ুরেখা বা জ্যোতিষ শাস্ত্রে হৃদয়রেখা বলে। এই রেখা যদি কোন জায়গায় কাটা না থাকে অর্থাৎ ছিন্ন হয়ে না যায় তাহলে সে

ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হয়ে পরম সুখে দিন কাটায়। জীবনে যে নারীকে কখনও দুঃখ ভোগ করতে হয় না। এটাই শাস্ত্রের কথা।

কনিষ্ঠাত্তর্জ্জনীং যাবৎ রেখা ভবতি চাক্ষতা।
সা সুখী সুখভাগিনী সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিতা ॥

এবারে মহাদেব তাঁর রতিশাস্ত্রে নারীর এমন একটি লক্ষণ বর্ণনা করলেন যা অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ। এরূপ লক্ষণ যদিও খুব বেশি দেখা যায় না, তবু যে সব নারীর দেহে এই চিহ্ন দেখা যায় তাদের দুঃখকষ্টের শেষ থাকে না।

যদি কোন নারীর একটি কান ছোট অন্যটি বড় হয় অর্থাৎ দুটি কান সমান না হয়ে ছোট বড় হয় আর তার স্তনদ্বয়ে লোম জন্মে, সেই নারী যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন তাকে মহাক্লেশে দিন কাটাতে হয়। চিরদিন তাকে চোখের জলে ভাসতে হয়।

বিষমৌ শ্রবণোযস্যাঃ স্তনৌ রোমসমন্বিতৌ।
জীবন্তী জীবনং দেবি তস্যাঃ ক্লেশায় কেবলম্ ॥

যে নারীর করতলে মীনরেখা বা মাছের আকৃতির রেখা থাকে সে সুভগা, স্বস্তিকচিহ্ন থাকলে কুলের যশ বৃদ্ধিকারী সন্তানের জননী হয়। যার হাতে পদ্মচিহ্ন থাকে সেই নারী রাজমহিষী (রাজার স্ত্রী) হয়। তার গর্ভে যে ছেলে হয় সেও বিখ্যাত হয় এবং রাজপদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

যে নারীর হাতে প্রাকার বা তোরণের চিহ্ন থাকে সে যদি খুব গরীবও হয় এমন কি দাসকূলে জন্ম নিলেও সে পরম সৌভাগ্য লাভ করবে। রাজরাণীর মত ধনীর ঘরে তার বিবাহ হবে এবং সে রাজরানী পর্যন্ত হতে পারে।

মৎস্যেন সুভগা নারী স্বস্তিকেন চ সুপ্রজা।
পদ্মেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েৎ ভূপতিংসুতং ॥
প্রাকারতোরণং রেখা যস্যাঃ পাণিতলে ভবেৎ।
অপি দাসকূলের জাতাঃ রাজ্ঞিত্বমধিগচ্ছতি ॥

যে নারীর হাতে ত্রিশূল, খড়্গ, শক্তি বা দুন্দুভির রেখা থাকে সেই নারী পৃথিবীর মধ্যে কীর্ত্তিশালিনী হয়। নারীর হাতে অঙ্কুশকুন্ডল মাছের চিহ্ন থাকলে সেই নারীর পতি দীর্ঘদিন জীবিত থাকে। সে নিজেও বহু সন্তানের জননী হয়ে সুখে দিন কাটায়।

ত্রিশূলাসি গদাশক্তি দুন্দুভ্যাকৃতিরেখয়া।
নিতম্বিনী কীর্ত্তিমতী সা নারী পৃথিবীতলে ॥
অঙ্কুশং কুন্ডলং যানং যস্যা পাণিতলে ভবেৎ।
দীর্ঘায়ুষং পতিং প্রাপ্য পুত্রবৃদ্ধিঃ ভবেৎ ধ্রুবং ॥

যে নারীর হাতে বজ্র আর প্রাসাদের রেখা থাকে সে নারী তীর্থকর পুত্র পায়—অর্থাৎ তার পুত্র তাকে বহু তীর্থ ভ্রমণ করায়। যার হাতে শকট বা মৃগ চিহ্ন থাকে সে নারী কৃষকের পত্নী হয়ে মোটামুটি অবস্থায় দিন কাটায়।

প্রাসাদ বজ্রাভা রেখা সুতে তীর্থকরং সুতং।
কৃষীবলস্য পত্নী স্যাৎ শকটেন মৃগেণ বা ॥

যে নারীর পায়ের নীচে বা চরণতলে লম্বা বিস্তৃত রেখা থাকে সে রাজার স্ত্রী হয়ে থাকে। যে নারীর পায়ের গড়ন স্নেহযুক্ত অর্থাৎ চাকচিক্যশালী, মনোহর, উন্নত ও তাম্রবর্ণ নখযুক্ত হয় আর দুটি পায়ের তলে মীন, অঙ্কুশ, রক্ত, লাঙ্গল প্রভৃতি চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সেই নারী কল্যাণকারিণী হয়। সে পরিবারের সকলের সুখবৃদ্ধি করে এবং নিজেও সুখী হয়।

যস্যাঃ পাদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা।
তাম্রনখৌ স্নিগ্ধন্নতৌ নার্য্যশ্চ চরণৌ শুভৌ।
মৎস্য অঙ্কুশজচিহ্নৌ চক্রলাঙ্গল লক্ষিতৌ ॥

যে নারীর অঙ্গুলি খুব দীর্ঘ সে কুলটা হয়ে থাকে।

যে নারীর পায়ের আঙ্গুলগুলি কৃশ বা সরু সরু, সে নারী অত্যন্ত ধনহীনা বা গরীব হয়ে থাকে। যে নারীর পায়ের আঙ্গুলগুলি ছোট ছোট সে বেশিদিন জীবিত থাকে না। তাকে অল্পদিনের মধ্যে ইহলীলা শেষ করতে হয়। আর যে নারীর পায়ের আঙ্গুলগুলি কুটিল বা আকাবাঁকা ও মোটা গাঁটযুক্ত, সে ভগ্ন অবস্থায় সারা জীবন অতিবাহিত করে। শাস্ত্রের ভাষায়—

দীর্ঘাঙ্গুলিভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্ধনা।
হ্রস্বায়ুষ্যা চ হ্রস্বাভিভুগ্নাভির্ভুগ্নবর্ত্তিনী ॥

যে নারীর নিতম্ব বেশ উন্নত ও মৃগীর মত চতুরস্র সেই নারী কল্যাণকারিণী হয়ে থাকে।

যে নারীর নিতম্ব উন্নত, মাংসল ও বিস্তৃত হয় সেই নারী পরম সুখে কালাতিপাত করে।

যে নারীর নিতম্ব সরু এবং মাংসল নয় সে দুঃখে দিন কাটায় সন্দেহ নেই।

সমুন্নতো নিতম্বশ্চ চতুরস্রো মৃগীদৃশাং।
নিতম্ববিম্বো নারীণাং উন্নতো মাংসল পৃথুঃ।
মহাভোগায় সংপ্রোক্তং তদন্যোহশর্ম্মণায় চ ॥

যে নারীর নাভি বেশ প্রশস্ত ও গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্তবিশিষ্ট অর্থাৎ ডান দিকে পাক দিয়েছে সে কল্যাণকারিণী ও শুভ ফলদায়িনী হয়ে থাকে।

যে নারীর পেট অত্যন্ত বৃহৎ সে নিঃসন্তান ও দুর্ভাগিনী হয়।

যে নারীর জঠর লম্বিত অর্থাৎ লম্বা হয়ে নিচে নিমে আসে, অল্পদিনের মধ্যে তার শ্বশুর ও দেবরের প্রাণ বিনাশ হয়ে থাকে।

নাভিভিঃ প্রশস্তা দক্ষিণাবর্ত্তিকা শুভা।
সুবিশালোদরী নারী নিরপত্যা চ দুর্ভগা।
প্রলম্ব জঠরা হন্তি শ্বশুরঞ্চাপি দেবরং ॥

যে নারীর পেট কুম্ভাকৃতি বা মৃদঙ্গাকার অর্থাৎ পেট কুম্ভ বা মৃদঙ্গের মত, সে দরিদ্র হয়।

যার উদর কুষ্মাণ্ড অর্থাৎ কুমড়োর মত বা যবের মত, সে নারী অসৎ বংশীয়া বলে জানা যায়।

যে নারীর পেট অনুন্নত ও শিরাশূন্য এবং পেটের চামড়া কোমল, সেই নারী রোজ মিষ্টান্ন খায় এবং সে অত্যন্ত ভোগশালিনী হয়ে থাকে।

কুম্ভাকারং দরিদ্রায়াং জঠরঞ্চ মৃদঙ্গবৎ।
কুষ্মাণ্ডাভাং যবাভঞ্চ দুষ্কুলং জায়তে স্ত্রিয়াঃ ॥
উদরেণ হ্যতুঙ্গেন বিশিরেণ মৃদুত্বকা।
যোষিদ্ ভবতি ভোগাঢ্যা নিত্যমিষ্টান্নসেবিনী ॥

যে নারীর অঙ্গ মৃদু অর্থাৎ নরম, দেহের চর্ম কোমল ও স্নিগ্ধ, মুখ মনোহর, চক্ষু মৃগচক্ষুর মত অর্থাৎ হরিণনয়না, জানু, পেট মৃগের জানু ও পেটের মত সেই নারী যদি গরীবও হয়, এমন কি দাসীর গর্ভেও যদি তার জন্ম হয় তবু সে ধনী হয়—সে রাজার পত্নী অর্থাৎ রাজমহিষী পর্যন্ত হতে পারে।

মৃগনেত্রা মৃদ্বঙ্গী চ মৃগজানু মৃগোদরী।
দাসীজাতা চ সা কন্যা রাজানং পতিমাপ্নুয়াৎ ॥

যে নারীর দুটি বাহু রেখাবিশিষ্ট অর্থাৎ বহু শিরাযুক্ত, যে নারীর মুখে অনেক তিল থাকে, অধর ও ওষ্ঠ অর্থাৎ দুটি ঠোঁটই বাঁকা না হয়ে সোজা রেখার মত লম্বা, সে নারীর পতির মৃত্যু হয়—অর্থাৎ সে বিধবা হয়।

যস্যা রেখান্বিতৌ বাহু মুখে চ তিলকং ধ্রুবং।
সরলৌ অধরোষ্ঠৌ চ ক্ষিপ্রং বিধবালক্ষণম্ ॥

যে নারীর গ্রীবাদেশে অর্থাৎ গলায় তিনটি রেখা দেখা যায়, সে চিরসুখ ভোগ করে। এই লক্ষণটি খুবই ভাল সন্দেহ নেই।

যে নারীর গ্রীবার তিনটি রেখার সঙ্গে পেটেও ঠিক তিনটি রেখা অর্থাৎ তিনটি বলী দেখা যায়, তার সুখের সীমা থাকে না।

শুধু নারী নয়, পুরুষের পক্ষেও এই রেখা খুব শুভ। গলা ও পেটে তিনটি রেখা থাকলে সে পুরুষ রাজপদ হয়।

পুরুষের ললাটে তিনটি রেখা থাকলে তা খুব শুভ। সে রাজ-অনুগ্রহ লাভ করে।

যস্যাস্ত্রিরেখা গ্রীবায়াং কুক্ষিরেখাস্তথৈব চ।
সুখস্য ভাগিনী স্যাচ্চভূপতিস্যাল্পলাটকে ॥

যে নারী গৌরাঙ্গী অর্থাৎ টকটকে ফর্সা রঙ যার বা কৃষ্ণবর্ণা বা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা যার অঙ্গ, দাঁত, বদন, স্তন ও মস্তক স্নিগ্ধ সে নারী চিরদিন সুখ ভোগ করে থাকে।

যার মুখ চন্দ্রের মত মনোহর, শরীরকান্তি তরুণ অরুণের মত টকটকে লালচে ফর্সা চোখ বিস্তৃত অর্থাৎ আয়ত ও লোহিত আভাযুক্ত থাকে, তাকে বিবাহ করলে তার স্বামীর কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে।

গৌরাঙ্গী বা তথা কৃষ্ণা স্নিগ্ধং অঙ্গং মুখং তথা।
দন্তাঃ স্তনং শিরো যস্যাঃ সা কন্যা সুখমেধতে ॥
চন্দ্রমুখী চ যা কন্যা বালসূর্য্যসমপ্রভা।
বিশালনেত্রা রক্তাক্ষী তাং কন্যাং বরয়েৎ বুধঃ ॥

যে নারীর পৃষ্ঠ ও পাশের হাড়গুলি অন্তর্নিমগ্ন ও পৃষ্ঠ মাংসল অর্থাৎ সমস্ত হাড়গুলি মাংসে ঢাকা থাকে, সে নারী কল্যাণদায়িনী হয়ে থাকে।

যে নারীর পিঠ লোমে পরিপূর্ণ সেই স্ত্রী পতিহীনা হয়ে থাকে সন্দেহ নেই। আর যে নারীর পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন অর্থাৎ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, হাড়গুলি উঁচু উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে ও তাতে অনেক শিরা দেখা যায়, সেই নারী দুঃখ ভোগ করে থাকে।

অন্তর্নিমগ্নবংশাস্থিঃ পৃষ্ঠ স্যাৎ মাংসলা শুভা।
পৃষ্ঠেন রোমযুক্তেন বৈধব্যং লভতে ধ্রুবম্।
ভুগ্নেন বিনতেনাপি সশিরেণাপি দুঃখিতা ॥

যে নারীর স্তনযুগল মূলে স্থূল ও ক্রমশঃ অগ্রভাগে কৃশ ও সূক্ষ্ম এবং লম্বাটে আকারের, তারা বাল্য অবস্থায় সুখভোগ করে, কিন্তু বৃদ্ধ অবস্থায় দুঃখ ভোগ করে থাকে।

যে নারীর দক্ষিণ (ডান) স্তন উচ্চ সেই নারী পুত্রবতী ও সকলের শ্রেষ্ঠা হয়, আর যার বাম স্তন উন্নত সেই নারীর একটি কন্যা সৌভাগ্যশালিনী হয়।

স্থূলৌ মূলে ক্রমকৃশাবগ্রে তীক্ষ্ণৌ পয়োধরৌ।
সুখদৌ বাল্যকালে তু পশ্চাদত্যন্তদুঃখদৌ।
দক্ষিণোন্নতবক্ষা পুত্রিনী বামোন্নতকুচা কন্যাং সৌভাগ্যবতীম্ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চার জাতির পুরুষের ললাটের ভাগ্যলিপি

নারী আর পুরুষের সুখদুঃখ স্থির করবার জন্য নানা কথা মহাদেব তাঁর রতি শাস্ত্রে বর্ণনা করলেন।

এই সব লক্ষণগুলি অত্যন্ত ধ্রুব—এর ফল কখনও ব্যর্থ হতে দেখা যায় না।

সুখদুঃখের মিলিত চিহ্ন যদি কারও দেহে থাকে তবে সঠিক পরিমাণে কোন্ চিহ্ন আছে তা দেখে বিচার করতে হবে।

সাধারণভাবে পুরুষের সুখদুঃখের বিভিন্ন লক্ষণ আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। এবার চার জাতির পুরুষের ললাটলিপি দেখে তাদের বিষয়ে বিচার করার পদ্ধতি মহাদেব বর্ণনা করলেন।

অবশ্য সুখদুঃখের চিহ্ন ললাটলিপি থেকে পৃথক। তবু সব মিলিয়ে বিচার করলে তা নিশ্চিত সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

মহাদেব প্রথমে শশক জাতির পুরুষের ললাটের বিভিন্ন রেখা বর্ণনা করলেন দেবী পার্বতীর কাছে।

শশক জাতীয় পুরুষের ললাটে যদি পাঁচটি রেখা দেখা যায় তবে তা দুর্ভাগ্যসূচক বলে জানতে হবে। এই জাতীয় পুরুষ জীবনে কখনও সুখী হয় না বলে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই ধরনের পুরুষের দেহে দুঃখের কারণে কোনও ক্ষতচিহ্নও দেখা যেতে পারে।

ললাটে দৃশ্যতে রেখা পঞ্চ দৌর্ভাগ্যসূচকাঃ।
দুঃসহ ক্ষতচিহ্নানি শরীরে প্রভবন্তি হি।
পুংসশ্চ শশজাতেস্তু ফলমীদৃঙ্ নিরূপিতম্ ॥

শশক জাতীয় পুরুষের ললাটে যদি তিনটি রেখা দেখা যায়, তবে নিজের হস্তগত কোনও বিষয় দ্বারাই তার ক্ষতি বা অনিষ্ট হয়ে থাকে। এর অর্থ—নিজের উপার্জিত বা নিজের প্রভাবে থাকা কোনও সম্পত্তি বা অন্য কিছুর ব্যাপারে তার অর্থহানি বা মামলা-মোকর্দমা, গোলমাল, মানসিক অশান্তি ইত্যাদি হয়ে থাকে বলে শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

ত্রিরেখা যদি দৃশ্যতে ললাটে শশকস্য তু।
স্বাধিকারেণ তস্যৈব মহাদ্ধানি প্রজায়তে ॥

শশক জাতীয় পুরুষের ললাটে সাতটি রেখা থাকলে তার কি ফল হবে? সাতটি রেখা দেখলেই ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে তা তিনটি ভাগে বিভক্ত কি না। যদি সাধারণ সাতটি রেখা হয় তবে কোনও ক্ষতি নেই—কিন্তু তিনটি ভাগে যদি তা বিভক্ত থাকে তবে সেই লোকের বহু ধনহানি ঘটবে। তিন ভাগে সাতটি রেখা কি ভাবে ভাগ করা যাবে? যেমন—২+২+৩ কিংবা ৪+২+১ এইভাবে তিনটি ভাগে রেখাগুলি ভাগ হয়ে অবস্থান করছে কিনা তা অবশ্য বিচার্য।

সপ্তরেখা ত্রিবিভক্তা নরস্য শশকস্য তু।
ধনহানির্ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

শশক জাতির পুরুষের ললাটে যদি কার্ম্মুক বা ধনুকের মত রেখা দেখা যায় তাহলে সেই জন দুশ্চরিত্র ও দুঃশীল হয়ে থাকে।

এখানে একটা কথা অবশ্য মনে রাখা উচিত।

শশক জাতীয় পুরুষের স্বভাব সাধারণতঃ নির্মল, ধর্মপ্রাণ, চরিত্রবান ও সুশীল হয়।

তাই এই রেখা থাকলে যে লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে তা হবে কেমন করে? এর অর্থ শশক জাতীয় পুরুষের স্বভাবজ গুণ সে পাবে। কিন্তু চরিত্রগত গুণ থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে দুশ্চরিত্রতা ও দুঃশীলা মনোভাব মাঝে মাঝে জেগে উঠবে। তবে অবশ্য শশক জাতীয় পুরুষের তুলনায় সে হবে দুশ্চরিত্র ও দুঃশীল।

কার্ম্মুকাকৃতি রেখা তু ললাটে যদি দৃশ্যতে।
দুশ্চরিত্রঃ স দুঃশীলঃ শশকো ভবতি ধ্রুবম্ ॥

শশক জাতীয় পুরুষের কপালে যদি হলাকৃতি রেখা বা চিহ্ন দেখা যায় তাহলে আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার অপমৃত্যু ঘটে।

সাধারণতঃ উপর থেকে নিচে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কোন উঁচু বাড়ি বা বৃক্ষ কিংবা ঘোড়ার পিঠে থেকে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হতে পারে।

হলচিহ্ন শশস্যৈব ললাটে যদি দৃশ্যতে।
স নিপ্রত্যোপরিষ্টাচ্চ ম্রিয়তে নাত্র সংশয় ॥

শশক জাতীয় পুরুষের ললাটের একদিকে যদি তিলচিহ্ন দেখা যায় তবে সেটা ভাল নয়। কারণ এই তিলচিহ্নের সঙ্গে যদি অন্যদিকে মশক চিহ্ন দেখা যায় তাহলে সেই পুরুষ নরহন্তা বা খুনী হবে। তাছাড়া তার ভাগ্যও ভাল হবে না—সারাজীবন তাকে কষ্টে কাটাতে হবে।

একতস্তিলকং ধৃত্বা অন্যতো মশকং তথা।
নরহন্তা ভবেৎ সোঽপি শশকো মন্দভাগ্যকঃ ॥

শশক জাতীয় পুরুষের ললাটের রেখার বিচার মোটামুটি সম্পূর্ণ বিষয় বর্ণনা করলেন মহাদেব।

তারপর তিনি অশ্ব জাতীয় পুরুষের ললাটের রেখাবিচার কিছু বর্ণনা করলেন।

অশ্ব জাতীয় পুরুষের কপালে যদি ধনুকের মত চিহ্ন থাকে তাহলে সেই পুরুষ জলে পড়ে যায় এবং তার ফলে কষ্ট পায়। তাছাড়াও সে জীবনে অনেক দুঃখ পায়। আর অশ্ব জাতীয় পুরুষের কপালে যদি সাতটি রেখা থাকে এবং সাতটিই সমান সমান হয় তাহলে সেই লোক উদ্বন্ধনে প্রাণ হারায় অর্থাৎ আত্মহত্যা করে।

পুরুষস্যাশ্চজাতেস্তু ধনুশ্চিহ্নং ভবেদ্ যা
নিপত্য জলগর্ভে তু মহদ্দুঃখমবাপ্নয়াৎ ॥
সপ্তরেখাঃ স্থিতা যস্য ললাটে তুরগস্য তু।
উদ্বন্ধনপ্রয়োগেন মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥

যদি কোন পুরুষের ললাটদেশে নয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখার মত চিহ্ন দেখা যায় তাহলে সেই পুরুষ শান্ত, দরিদ্র, সুশীল, বুদ্ধিমান, ক্রোধী, সরলস্বভাবযুক্ত, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শাস্ত্র অনুরাগী, চতুর ও মেধাবী হয় এতে কোন সংশয় নেই।

শান্তস্য চ দরিদ্রস্য সুশীলস্য মহামতেঃ।
রুষ্টস্য ঋতুশীলস্য প্রত্যুৎপন্নমতেস্তথা ॥
মেধাবিনোহনুরক্তস্য শাস্ত্রার্থে চতুরস্য চ।
নবরেখাঃ প্রদৃশ্যান্তে ভালে তস্য ন সংশয়ঃ ॥

যদি কোনও পুরুষের ললাটের বামদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন দেখা যায় তাহলে সেই পুরুষ বাচাল হয়ে থাকে—পন্ডিতেরা এই বিধান দিয়ে থাকেন।

দৃশ্যতে যদি চিহ্নঞ্চ বামভাগেহর্দ্ধচন্দ্রবৎ।
বক্তারং তং বিজানীয়াৎ নির্দ্দিষ্টঞ্চ মনীষিভিঃ ॥

যদি কপালের নিচের দিকে একটি ক্ষুদ্ররেখা থাকে এবং তার উর্দ্ধে তার চেয়ে বৃহৎ একটি রেখা যায়, তাছাড়া ঐ দুটি রেখার মধ্যস্থলে যদি একটি দীর্ঘরেখা দেখা যায় তাহলে সেই পুরুষ ধনধান্যশালী হয়ে থাকে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অধস্তাৎ ক্ষুদ্ররেখা চ উর্দ্ধে মধ্যমিকা তথা।
মধ্যভাগে চায়তা চেদ্ ধনধন্যবিবর্দ্ধিনী ॥

যে পুরুষের কপালে ছয়টি সোজা রেখা দেখা যায় সে নিশ্চয়ই সৎ চরিত্র ও সুশীল হয়। তার গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ থাকে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ষড়রেখাঃ সংস্থিতা যস্য ললাটে পুরুষস্য চ।
সরলঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ সুশীলো ধনবান্ স্মৃতঃ ॥

যে পুরুষের কপালে দুটি বাঁকা চক্রাকার রেখা ও তার নিচে ছোট একটি সরল রেখা এই ত্রিরেখা দেখা যায় সে নিশ্চয়ই বৃক্ষ বা কোনও উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়।

কিন্তু যদি কপালে তিনটি রেখা মাত্র থাকে এবং তিনটিই সোজা হয় (সরল), একটুও বাঁকা না থাকে, ছোট থাকে এবং তিনটি রেখা সমান হয় তবে সে ব্যক্তি খল, ক্রুর, বঞ্চক ও নরঘাতী পর্যন্ত হতে পারে এটি শাস্ত্রবাক্য।

দ্বিচন্দ্রৌ রেখা ভালে একঃ সরলঃ পশ্চাতে।
নিপত্য উপরিষ্ঠাচ্চ ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভালে ক্ষুদ্র ত্রিসমারেখা যদি ভবতি তাদৃশী।
হন্তারং ত্বং বিজানীয়াৎ খলং ক্রুবঞ্চ বঞ্চকং ॥

যে লোকের কপালে কার্মূকের মত রেখা দেখা যায় অর্থাৎ নানা আকৃতির রেখা দেখা যায় সে লোক দুশ্চরিত্র, দুঃশীল ও নরাধম হয়ে থাকে।

কার্মূকাকৃতি রেখা তু দৃশ্যতে যস্য দেহিনঃ
দুশ্চরিত্রশ্চ দুঃশীলঃ স লোকে চাধমঃ স্মৃতঃ ॥

কপালে যদি নিচের দিকে একটি ক্ষুদ্ররেখা, উর্দ্ধে তার চেয়ে একটি বৃহৎ রেখা আর দুটি রেখার মধ্যভাগে একটি দীর্ঘরেখা যদি দেখা যায়—যার কপালে ঐভাবে তিনটি রেখা থাকে, সে ধনধান্যশালী ও সমৃদ্ধিপূর্ণ লোক হবে। এটি রতিশাস্ত্রে মহাদেবের বচন।

অধস্থাৎ ক্ষুদ্ররেখা চ উর্দ্ধে মধ্যমিকা তথা।
মধ্যে চ আয়তা রেখা ধনধান্যপ্রবৰ্দ্ধিনী ॥

যদি পুরুষের কপালে তিনটি সরল রেখা সমান এবং দীর্ঘ লম্বা হয় তাহলে এই ত্রিরেখাযুক্ত লোক বাগ্মী, সুস্বভাব, নীতিবান, ভাগ্যশীল, ধন্যবাদার্হ, উপকারী ও সব লোকের প্রিয় হয়ে থাকে।

এমন কি এই লোক জননেতা, খ্যাতিমান, মন্ত্রী ইত্যাদিও হতে পারে।

দৃশ্যতে যস্য ভালে রেখাত্রয়ং দীর্ঘং সমায়তং।
বাগ্মী চৈব সুশীলশ্চ নীতিমান ভাগ্যবাংস্তথা ॥
ধন্যশ্চ প্রিয়ভাষী চ সৰ্ব্বজনপ্রিয়ঙ্করং
অভিরামশ্চ সর্ব্বেষাং তথা চানন্দবৰ্দ্ধনঃ ॥

যে লোকের কপালে মাত্র দুটি ছোট রেখা থাকে এবং দুটি সরল রেখা হয় সে ব্যক্তি রোগী, দরিদ্র এবং অর্থহীন হয়ে থাকে সন্দেহ নেই।

কিন্তু যদি মাত্র দুটি ছোট বক্র রেখা সমান্তরাল থাকে তবে সে ব্যক্তি কৌশলী, শঠতাচরণ ও বলপূর্ব্বক অন্যের ধন অপহরণ করে অজস্র অর্থ উপার্জন করবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

রেখাদ্বয়ং যথাদৃষ্টং যস্য ভালে প্রদৃশ্যতে।
দরিদ্রঃ স চ বিজ্ঞেয়ঃ চিররোগী ধনোজ্ঝিতঃ ॥
দ্বিচক্র দৃশ্যতে চিহ্নং ললাটে যস্য জন্তুনঃ।
শাঠ্যেনৈব বলেনৈব লভতে বিপুলং ধনম্ ॥

নারীর ললাটরেখা বিচার

মহাদেব এইভাবে পুরুষের ললাটের যাবতীয় রেখা ও তার বিস্তৃত ফলাফল বর্ণনা করলেন।

মানুষের জন্মের সময় বিধাতা ললাটে যে প্রত্যেকের ভাগ্যলিপি লিখে দেন তাতে সন্দেহ নেই।

মহাদেব তাঁর রতিশাস্ত্রেও সেই বিধান দিয়েছেন—তবে সেই ভাগ্যলিপি কি ভাবে পাঠ করতে হবে তা জানা দরকার।

তাই পুরুষ ও নারীর ললাটরেখা পৃথক পৃথক আলোচনা করে এ বিষয়ে বিস্তৃত বুঝিয়ে দিয়েছেন।

যে নারীর ললাটে ত্রিশূল চিহ্ন আঁকা থাকে অর্থাৎ ত্রিশূলের মত আকারের রেখা দেখা যায় সে নারী হাজার হাজার নারীর মধ্যেও খ্যাতি লাভ করে। সে বিখ্যাত নারী হয়।

ভালস্থেন ত্রিশূলেন নির্ম্মিতেন স্বয়ম্ভুবা।
নিতম্বিনী সহস্রাণাং স্বামিত্বং যোষিদাপ্নুয়াৎ ॥

নারীর ললাটের এই ত্রিশূলচিহ্ন যদি রক্তবর্ণ বা লালচে হয় তবে এই ফল হয়। যদি তা কৃষ্ণবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ হয়ে থাকে তবে সেই নারী পাঁচটি সন্তান প্রসব করে এবং তার ধনধান্য ইত্যাদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

ললাটে দৃশ্যতে যস্যাস্ত্রিশূলং কৃষ্ণপিঙ্গলং
সা পঞ্চ জনয়েৎ পুত্রান্ ধনধান্যং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥

যে নারীর কপালে কোন শিরা নেই, লোম নেই, অর্ধচন্দ্রের আকৃতিবিশিষ্ট যার কপাল উন্নত ও তিন আঙ্গুল পরিমিত, সে নীরোগিণী ও সৌভাগ্যবতী হয়। যার কপালে স্বস্তিকচিহ্ন দেখা যায় সে অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারিণী ও সম্পদের অধিকারিণী হয়, এটি শাস্ত্রের বচন।

ভাল শিরাবিরহিতো নির্লোমার্দ্ধেন্দুসন্নিভঃ।
অনিম্নস্ত্র্যঙ্গুলো নার্য্যাঃ সৌভাগ্যারোগ্য কারণং।
ব্যক্তস্বস্তিকরেখশ্চ ললাটং রাজ্যসম্পদে ॥

যে নারীর ললাটের আকার অর্ধচন্দ্রের মত, অনুন্নত, লোমহীন ও সুদৃশ্য সে রাজপদ লাভ করে।

আর যে নারীর ললাটদেশ প্রলম্বিনী বা লম্বা রেখা দেখা যায় সে বিবাহের পর অল্পদিনের মধ্যে দেবরঘাতিনী হয়ে থাকে অর্থাৎ তার দেবর মারা যায়।

শুভমর্দ্ধেন্দুসংস্থানমতুঙ্গং স্যাদলোমশং।
নৃপতীনাং ভবেচ্চিহ্নং ললাটং শুভদর্শনম্ ॥
প্রলম্বিনী ললাটে তু দৈবরং হন্তি চাঙ্গনা ॥

যে নারীর ললাটে মাত্র একটি রেখা বিদ্যমান থাকে আর শ্রীবৎস স্বস্তিকচিহ্ন দেখা যায় সে পরম মঙ্গলের পাত্রী হয়।

যে নারীর বাঁ-দিকের কপালে মশকের মত চিহ্ন দেখা যায় সে যাবজ্জীবন মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে।

একরেখা ভবেদ্ যস্যা ললাটে শোভনা ভবেৎ।
শ্রীবৎসং স্বস্তিকঞ্চৈব ললাটে দৃশ্যতে সদা।
বামভালে মশকশ্চ শোণোমিষ্টান্নদঃ শুভঃ ॥

যে নারীর ললাট বা সীমন্ত দক্ষিণাবর্ত অর্থাৎ ডানদিকে পাক খায় এবং বাঁকা রেখা দেখা যায় সে কুলক্ষণা সন্দেহ নেই। এরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নয়।

যদি ললাটের ঠিক মাঝখানে এরূপ দক্ষিণাবর্ত রেখা দেখা যায় তবে সে বিবাহের এক বছরের মধ্যে বিধবা হয়।

সীমন্তেহথ ললাটে বা ত্যজা দূরাৎ প্রয়ত্নতঃ।
সা পতিং হন্তি বর্ষেণ যস্যা চ মধ্যললাটে।

যে নারীর ললাটে একটি বা দুটি রেখা দেখা যায় আর সেই রেখা গোলাকার বামাবর্ত কিংবা দক্ষিণাবর্ত হয় আর মূর্দার বাঁ-দিকে দুটি বামাবর্ত রেখা থাকে, সেই নারী অলক্ষণা সন্দেহ নেই। সে তার বিবাহের পর মাত্র দশদিনের মধ্যে পতিহীনা হয়। পন্ডিতগণ এরূপ কন্যাকে সর্বদা পরিত্যাগ করে থাকেন।

প্রদক্ষিণো বা বামো বা রোম্নামাবর্ত্তকঃ স্ত্রিয়াঃ।
একো বা মূর্দ্ধণি দ্বৌ বা বামে বামগতৌ যদি।
আদশাহং পতিঘ্না সা ত্যজ্যা দূরাৎসুবুদ্ধিনা ॥

নবম পরিচ্ছেদ

আদ্যঋতুর ফল

গিরিরাজনন্দিনী পার্বতী ধৈর্যসহকারে মহাদেবের কাছ থেকে সমস্ত শাস্ত্রবচন শুনলেন।

তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠল।

মহাদেবের মত জ্ঞানী যে সারা বিশ্বে দুর্লভ তা তিনি তাঁর মুখ থেকে সমস্ত শাস্ত্রবচন শুনে স্পষ্টই বুঝতে পারলেন।

তিনি তখন অত্যন্ত বিনয় বচনে ধীরে ধীরে মহাদেবকে বললেন—হে দেব! আপনার মুখে সমস্ত শাস্ত্রবচন শুনলাম। আপনার পায়ে আমার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার।

এখন আপনার নিকট আমি যা জানতে চাই, আশা করি ত আমার কাছে বর্ণনা করে আমার মনের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবেন।

নারীজাতির ঋতুলক্ষণের বিষয় শোনবার জন্যে আমার একান্ত কৌতূহল হয়েছে। অর্থাৎ নারীজাতি যখন প্রথম রজঃস্বলা হয় তার তিথি, মাস, নক্ষত্র, বার প্রভৃতি দোষ-গুণে কিরূপ ফল পাওয়া পায় তা কৃপা করে আমাকে বলুন।

শ্রুতং ত্বয়েরিতং সর্ব্বং নমস্তেহস্তু নমোনমঃ।
আধুনা ব্রুহি মে দেব নারীণাং ঋতুলক্ষণং॥

দেবীর কথায় মহাদেব সন্তুষ্ট হলেন।

তিনি বললেন—হে দেবি! এবার আমি নারীদের ঋতুলক্ষণগুলি একে একে বর্ণনা করছি, তুমি শ্রবণ কর। এগুলি শুনলে রতিশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে।

সবার আগে তিথিফল অর্থাৎ কোন্ তিথিতে আদ্যঋতু হলে কিরূপ ফল হয় সে বিষয়ে বলতে উদ্যত হয়েছি। তুমি নিবিষ্ট মনে আমার বাক্য শ্রবণ কর।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নারীণাং ঋতুলক্ষণং।
যচ্ছ্রুত্বা জায়তে জ্ঞানং রতিশাস্ত্রে মহেশ্বরি॥
তত্রাদৌ তু প্রবক্ষামি তিথিনাং ফলমুত্তমং॥
শৃণুষ্বেকমনা ভূত্বা রতিশাস্ত্রোদিতং যথা।

আদ্যঋতুর তিথিফল

মহাদেব বললেন—হে দেবি! এখন আদ্যঋতুর তিথিফল শোন।

প্রথমা অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে যে নারীর ঋতুপদ্ম বিকশিত হয়, যে নারী শমনভবনে যায় অর্থাৎ অল্পদিনে তার মৃত্যু হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হে প্রিয়ে! যদি দ্বিতীয়া তিথিতে কোন নারী প্রথম ঋতুমতী হয়, তাহলে সেই নারীর স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতা কমে যায়, এই নির্দেশ দিয়ে থাকেন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা।

হে মহেশ্বরি! তৃতীয়া তিথিতে যদি নারীজাতির কমল বিকাশপ্রাপ্ত হয় তাহলে তার ঋতু বিফল হয়ে যায়। তাতে কোন সন্তান জন্ম হয় না।

হে দেবি, তার পরবর্তী ঋতুদর্শনের বর্ণনা শোন। চতুর্থী তিথিতে কোন নারী যদি প্রথম ঋতুদর্শন করে, তা হলে সে বন্ধ্যা হয়ে থাকে।

যদি পঞ্চমী তিথিতে কোন নারী ঋতুদর্শন করে, তা হলে সে অল্পদিনের মধ্যে মারা যায়। এ কথা শাস্ত্রের বচন।

ষষ্ঠী তিথিতে যদি কোন নারী আদ্যঋতু দর্শন করে তবে তার অবস্থা প্রথমার মত হয়, অর্থাৎ সেও অল্পদিনের মধ্যে মারা যায়। এ কথা নিশ্চিত সত্য।

সপ্তমী তিথিতে কোন নারী আদ্যঋতু দর্শন করলে সে হয় কাকবন্ধ্যা, আর অষ্টমী তিথিতে আদ্যঋতু যদি নারীর হয়, সে হয় নাগিনীস্বরূপা অর্থাৎ মন হয় হিংসুটে ও বিদ্বেষভাবাপন্ন।

হে দেবি, যে নারী নবম তিথিতে প্রথম ঋতুদর্শন করে, তাকে নারী জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট বলে জানা যায়। সে নারী সুসন্তানের জননী হয়।

কিন্তু দশমী তিথিতে আদ্যঋতু দর্শন করলে সেই নারী হয় রাক্ষসী স্বরূপা অর্থাৎ রাক্ষসীর মত ভয়াবহ। এটি যে নির্ভুল কথা, তা শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেছেন।

একাদশী তিথিতে কোনও নারী যদি আদ্যঋতু দর্শন করে তবে তাকে ডাকিনী বলে জ্ঞান করবে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

দ্বাদশা তিথিতে যে কন্যা ঋতুমতী হয় তাকে যোগিনী বলে জ্ঞান করতে হবে।

ত্রয়োদশী তিথিতে যে নারী আদ্যঋতু দর্শন করে, সে খুবই পতিব্রতা ও পতিভক্তিপরায়ণা। সে আদর্শ গৃহিণী হয়, এটি শাস্ত্রের কথা।

চতুর্দ্দশী তিথিতে যদি কোনও নারী আদ্যঋতু দর্শন করে তবে সে লক্ষ্মীভ্রষ্টা হয় অর্থাৎ তার ধন-দৌলত নষ্ট হয়।

পূর্ণিমা তিথিতে যদি কোনও নারী ঋতুমতী হয়, তাকে দেবীরূপিণী অর্থাৎ সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী বলে জ্ঞান করবে।

আর যদি অমাবস্যা তিথিতে কোন নারী ঋতুমতী হয় সে জরা রোগ ইত্যাদিতে ভুগে থাকে।

এগুলি শাস্ত্রোক্ত ভাষায়—

বিকসতি যদা পদ্মং প্রথমায়াং মহেশ্বরি।
অচিরাৎ ম্রিয়তে সৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
দ্বিতীয়ায়াং ভবেন্নারী যদি রজস্বলা প্রিয়ে।
স্মৃতের্লোপা ভবেচ্চৈব ইতি শাস্ত্রবিদাং মতং ॥

বিকসতি যদা পদ্মং তৃতীয়ায়াং মহেশ্বরি।
ঋতুব্যর্থা ভবেন্নারী শৃণু-তৎপরতো যথা ॥
পঞ্চম্যাং ম্রিয়তে নারী চতুর্থী বন্ধকী তথা।
ষষ্ঠ্যাং বিকসিত পদ্মং পঞ্চমী ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
সপ্তম্যাং কাকবন্ধ্যা তু অষ্টম্যাং নাগিনী ভবেৎ।
মানবজাতিয়াং বিদ্যাং নবম্যাং দেবী সত্তমে ॥
বিকসতি যদা পদ্মং দশম্যাং পক্ষয়োর্দ্দয়েনঃ ॥
রাক্ষসী সা ভবেন্নারী গীয়তে তু মনীষিভিঃ ॥
একাদশ্যাস্তিথৌ নারী যদি রজোবতী ভবেৎ।
ডাকিনী তাং বিজানীয়াৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
দ্বাদশ্যাং যোগিনী চৈব যদি কন্যা রজস্বলা।
পতিব্রতা ভবেচ্চৈব ত্রয়োদশ্যাং মহেশ্বরি ॥
লক্ষ্মীহীনা চতুর্দ্দশ্যাং কীর্ত্তিতং বিবুধৈরিতি।
পূর্ণিমায়াং ভবেন্নারী দেবী সা লক্ষ্মীরূপিণী ॥
অমবস্যাস্তিথৌ নারী যদি রজস্বলা ভবেৎ।
জরাব্যাধি সমাকীর্ণা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

আদ্যঋতুর বারফল

আদ্যঋতুর তিথিফল বর্ণনা শেষ হলো।

মহাদেব তারপর বললেন—এবারে আদ্যঋতুর বারফল অর্থাৎ কি কি বারে আদ্যঋতু দেখলে কি কি ফল হয় তা বর্ণনা করব।

রবিবারে যদি কোনও নারী আদ্যঋতু দর্শন করে, অতি সত্বরই সে বিধবা হয়।

যদি সোমবারে কোন নারী আদ্যঋতু দর্শন করে বা প্রথম ঋতুমতী হয়, তা হলে সে পতিব্রতা হয়।

মঙ্গলবারে আদ্যঋতু দর্শনে কুলটা ও বুধবারে দর্শনে সে সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়।

যে নারী গুরুবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে প্রথম ঋতুমতী হয়, তার স্বামী বহু ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে।

শুক্রবারে ঋতুমতী হলে সে নারী বহু পুত্রবতী হয়। যে নারী শনিবারে প্রথম রজস্বলা হয়, সে বন্ধ্যা হয়—শাস্ত্রে এইরূপ কথা লেখা আছে। শাস্ত্রবিদ্‌দের নির্দেশ কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

রবৌ চ বিধবা নারী সোমে পতিব্রতা ভবেৎ।
মঙ্গলে কুলটা চৈব বুধে সৌভাগ্যসংযুতা ॥
গুরৌ ঋতুমতী নারী লভতে ধনিনাং পতি।

বহুপুত্রা ভবেন্নারী শুক্রে দৈত্যগুরৌতথা।
শনৌ বন্ধ্যা ভবেচ্চৈব ইতি শাস্ত্রবিদাং মতং ॥

আদ্যঋতুর মাসফল

মহাদেব তারপর আদ্যঋতুর মাসফল অর্থাৎ কি কি মাস আদ্যঋতু দর্শনে কি কি ফল হয় তা বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন—হে দেবি, এগুলি মন দিয়ে শ্রবণ করলে প্রচুর জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

যে নারী বৈশাখ মাসে প্রথম ঋতুমতী হয়, সে অত্যন্ত প্রিয়বাদিনী ও মিষ্টভাষিণী হয়ে থাকে।

যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম ঋতুদর্শন হয়, তাহলে সেই নারীকে বিধবা হতে হয়—এতে সন্দেহ নেই।

আষাঢ় মাসে প্রথম ঋতুমতী হলে ধনবতী হয়।

শ্রাবণ মাসে আদ্যঋতু দর্শনে মৃতাপত্যা অর্থাৎ পুত্র মারা যায়। ভাদ্রে রোগিণী আশ্বিনেও মৃতপুত্রা হয়।

কার্ত্তিকে প্রথম ঋতুদর্শন করলে স্বকুলনাশিনী হয় অর্থাৎ নিজের কুলের কেউ মারা যায়।

অগ্রহায়ণে প্রথম ঋতুদর্শন করলে খুব শুভ—এতে সেই নারীর মন সর্বদা ধর্মপথে থাকে।

পৌষ মাসে ঋতুদর্শন করলে সে মদনকাতর হয়। মাঘে পতিব্রতা, ফাল্গুনে বহু পুত্রবতী ও চৈত্রে মদন-উন্মাদিনী হয়ে থাকে।

শাস্ত্রোক্ত ভাষায়—

অধুনা ত্বাং প্রবক্ষ্যামি মাসফলং মহেশ্বরি।
শৃণুষ্বৈকমনা ভূত্বা জ্ঞাত্বা বিজ্ঞতমো ভবেৎ ॥
বৈশাখে প্রিয়ভাষী চ জ্যৈষ্ঠে তু বিধবা ভবেৎ।
আষাঢ়ে ধনবতী কন্যা মৃতাপত্যা চ শ্রাবণে ॥
ভাদ্রে রোগসমাকীর্ণা আশ্বিনে মৃতপুত্রকা।
স্বকুলধ্বংসিনী চৈব কার্ত্তিকে রমণী ভবেৎ ॥
ধর্ম্মশীলা মার্গশীর্ষে পৌষে মদনবিহ্বলা।
মাঘে পতিব্রতা চৈব ফাল্গুনে বহুপুত্রিকা।
মদনোন্মাদিনী চৈত্রে মাসফলং প্রকীর্ত্তিতং ॥

আদ্যঋতুর নক্ষত্রগত ফল

শিব বললেন—হে পার্বতি, এবারে আদ্যঋতুর নক্ষত্রগত ফল শ্রবণ কর। এগুলি সব জানতে পারলে রতিশাস্ত্রে যেন দিব্যচক্ষু লাভ করতে পারবে।

বিভিন্ন নক্ষত্রে আদ্যঋতু হলে বিভিন্ন ফল হয়। কতকগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে।

পূর্বভাদ্রপদ, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, মৃগশিরা, ভরণী, রোহিণী ও আর্দ্রা এই সব নক্ষত্রে আদ্যঋতু হলে সেই নারীকে বিধবা হতে হয়।

যদি পুনর্বসু নক্ষত্রে প্রথম ঋতুদর্শন ঘটে তাহলে সেই নারী শোকার্ত্তা ও বন্ধ্যা হয়।

কৃত্তিকা ও জ্যেষ্ঠা এই দুই নক্ষত্রে ঋতুমতী হয়ে থাকলে সেই নারী দরিদ্রা হয়। এই কথাই মনীষীরা বলেছেন। এ ছাড়া অন্য নক্ষত্রগুলির ফল ভাল হয়।

পূর্ব্বভাদ্রপদা চৈব তথা তু পূর্ব্বফল্গুনী।
পূর্ব্বাষাঢ়া চ ভরণী মৃগার্দ্রারোহিণীষু চ ॥
রজস্বলা যদি তেষু বিধবা নাত্র সংশয়ঃ।
মেষে শোকাতুরা চৈব বন্ধ্যাদিতৌ তু কামিনী ॥
কৃত্তিকায়াঞ্চ জ্যেষ্ঠায়াং যদি রজস্বলা ভবেৎ।
অর্থহীনা ভবেন্নারী কথ্যতে হি মনীষিভিঃ।

নন্দাদি পাঁচ তিথিতে আদ্যঋতুর ফল

মহাদেব তারপর নন্দাদি পাঁচটি তিথিতে আদ্যঋতু দর্শনের ফল বইতে উদ্যত হলেন।

নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা, পূর্ণা তিথি তাকে বলে তা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রতিপদ, একাদশী, ষষ্ঠী এই তিনটি তিথি নন্দা নামে অভিহিত। দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী এই তিন তিথিকে বলে ভদ্রা। তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী এই তিনটি তিথিকে বলা হয় জয়া। নবমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই কয়টি তিথিকে পূর্ণাতিথি বলে। এটাই মহাত্মাদের নির্দেশ চতুর্থী পঞ্চমী ও দশমী তিথিকে রিক্তা তিথি বলা হয়।

মহাদেব বললেন—যে নারী নন্দাতে প্রথম ঋতুমতী হয়, সে একান্ত পতিপরায়ণা হয়ে থাকে।

ভদ্রা তিথিতে যে নারী প্রথম ঋতুদর্শন করে, সে পতিব্রতা ও ধর্মে অনুরক্তা হয়।

পূর্ণা তিথিতে যে নারী প্রথম ঋতুমতী হয়, সেই যুবতী পুত্রকন্যাবতী হয়ে থাকে।

যে নারী জয়াতে প্রথম ঋতুমতী হয়; সে জগতের সকলের কাছে সম্মানের পাত্রী হয়। আর যে নারী রিক্তাতে আদ্যঋতু দর্শন করে, সে অল্পদিনের মধ্যে শমন ভবনে যায় অর্থাৎ তার মৃত্যু ঘটে থাকে।

আদ্যঋতুমতী চৈব নন্দায়াং রমণী ভবেৎ।
পতিব্রতা ভবেৎ সৈব তথা ভদ্রা তিথির্ম্মতা ॥
পূর্ণাপত্যপ্রদা চৈব জয়া সম্মানবর্দ্ধিনী।
রজস্বলা রিক্তায়াস্তু ম্রিয়তে সৈব কামিনী ॥

মহাদেব তারপর বললেন—হে দেবি এই যে পাঁচটি তিথিতে ঋতুর বর্ণনা করলাম, এর মধ্যে আবার কিছু কিছু চিন্তার বিষয় আছে। যদি সিদ্ধিযোগ বা অমৃতযোগে ঋতু হয়, তাহলে তা মহাসুফল ও মঙ্গলদায়ক হবে।

কিন্তু পাপযোগে প্রথম ঋতু হলে অতীব দুঃখের ও অমঙ্গলের কারণ হবে।

এখন সিদ্ধিযোগ ও পাপযোগ কাকে বলে তা জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে বর্ণনা করছি, মন দিয়ে তা শোন।

এতেষু চ মহাদেবি, সিদ্ধিযোগো মহাফলঃ।
তথা চামৃতযোগস্তু পাপযোগো ভয়াবহঃ।
জ্যোতিষাং তু বিধানেন শৃণু যোগান্ মহেশ্বরি ॥

সিদ্ধিযোগ

যদি শুক্রবারে নন্দা, বুধবারে ভদ্রা, শনিবারে রিক্তা, মঙ্গলবারে জয়া এবং বৃহস্পতিবারে পূর্ণা তিথি হয়, তাহলে তাকে সিদ্ধিযোগ বলে।

শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া।
গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

অমৃতযোগ

যদি বুধবারে কিংবা শনিবারে নন্দা, মঙ্গলবারে ভদ্রা, বৃহস্পতিবারে জয়া, শুক্রবারে রিক্তা বা রবি ও সোমবারে পূর্ণাতিথি হয়, তাহলে তাকে অমৃতযোগ বলে। এই যোগ খুব শুভ ফলপ্রদ।

চন্দ্রার্কয়োর্ভবেৎ পূর্ণা কুজে ভদ্রা গুরৌ জয়া।
বুধমন্দৌ চ নন্দায়াং শুক্রে রিক্তামৃতা তিথিঃ ॥

পাপযোগ

যদি রবিবারে ও মঙ্গলবারে নন্দা, শুক্রবারে বা সোমবারে ভদ্রা, বুধবারে জয়া, বৃহস্পতিবারে রিক্তা এবং শনিবারে পূর্ণাতিথি হয়, তাহলে তাকে পাপযোগ বলা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্র বা অন্য শাস্ত্রাদি অনুযায়ী এই তিথি অশুভ।

আদিত্যভৌমযোর্নন্দা ভদ্রা শুক্র শশাঙ্কয়োঃ।
বুধে জয়া গুরৌ রিক্তা শনৌ পূর্ণা চ পাপদা ॥

নক্ষত্রের পাদভেদে আদ্যঋতুর ফলাফল

শিব বললেন—হে পার্বতি, নক্ষত্রের খণ্ডিতাখণ্ডিত ভেদে আদ্যঋতু হলে যেরূপ ফলাফল ঘটে তা বর্ণনা করছি, মন দিয়ে তা শোন।

যে সময় নক্ষত্র অখণ্ডিত থাকে, যদি সেই সময় কোনও নারী ঋতুমতী হয় তাহলে তা খুব ভাল লক্ষণ। যতদিন সেই নারী জীবিত থাকে, সে পরম সুখে কাল কাটাবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

যখন প্রথম ঋতু হয়, যদি সেই সময় নক্ষত্র দ্বিপাদ হয়, তাহলে সেই নারী আজন্ম দুঃখে অতিবাহিত করবে—পরম দুঃখে তার দিন কাটবে।

আর যদি সে সময় নারী প্রথম রজস্বলা হয় সে সময় নক্ষত্রের এক পাদ মাত্র ভগ্ন থাকে, তা হলে সেই নারী সারা জীবনে যতবার গর্ভধারণ করবে ততবারই তার গর্ভপাত ঘটবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

অখন্ডে চৈব নক্ষত্রে যদি ঋতুমতী ভবেৎ।
সুখং জীবতি সা নারী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
দ্বিপাখন্ডিতর্ক্ষে চ যদি রজস্বলা ভবেৎ।
দুঃখিনী সৈব বিজ্ঞেয়া আজন্মরাণান্তিকং ॥
নক্ষত্রে পাদভগ্নে যা তু ঋতুমতী ভবেৎ।
গর্ভং পতিত তস্যাশ্চ পুনঃ পূনর্মহেশ্বরি ॥

দিবা ও রাত্রিতে আদ্যঋতুর ফল

নক্ষত্রের পাদভেদে আদ্যঋতুর ফল শেষ হলো। এবারে দিন ও রাত্রিতে আদ্যঋতু হলে তার কি ফল হয় তা বর্ণনা করা হচ্ছে।

মহাদেব বললেন—শোন দেবি, দিন আর রাত্রিভেদেও আদ্যঋতু দর্শনে ফল পৃথক হয়, তা বর্ণনা করছি শোন।

যদি নারী রাত্রিকালে ঋতুমতী হয়, অর্থাৎ রাত্রে আদ্যঋতু দর্শন করে, তাহলে তার পতির পরম মঙ্গল হয়। যদি কোনও নারী দিবাভাগে ঋতুমতী হয়, তা হলে তার নিজের কল্যাণ সাধন হয়, অপরের হয় না।

আর দিন ও রাত্রির মধ্যভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে বা ভোরবেলা ঋতু দর্শন করলে সে নারী বন্ধ্যা হয়, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

রাত্রৌ ঋতুমতী নারী পতিমঙ্গলকারিণী।
যদ্যহ্নি চ ভবেন্নারী তদা স্বীয় হিতৈষিণী।
নিশাবসানে চ সন্ধ্যায়াং বন্ধ্যা ভবতি নিশ্চিতং ॥

এইভাবে আদ্যঋতু বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা শেষ করলেন দেবাদিদেব।

এখানে একটা কথা চিন্তা করতে হবে।

আদ্যঋতু দর্শনের সময় মাস, বার, তারিখ, নক্ষত্র ইত্যাদির বিভিন্ন ফল হয়ে থাকে।

তাই প্রতিটি বিষয়ে বিচার করে ভাল-মন্দ হিসাব করে বুঝতে হবে আদ্যঋতুর সময়টি শুভ না অশুভ হয়েছে এবং কি কি ফল হতে পারে।

উদাহরণ—এখানে একটি উদাহরণ দিয়ে ভালভাবে এ বিষয়ে বুঝিয়ে না দিলে জিনিসটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে বা তার শাস্ত্রগত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তাই এ বিষয়ে বুঝিয়ে বলা হচ্ছে।

মনে করা যাক, একটি নারী যেদিন ঋতুমতী হলো—দেখা গেল, সেটি ত্রয়োদশী তিথি, বৃহস্পতিবার, আষাঢ় মাস, পূর্ণাতিথি, সিদ্ধিযোগ, কৃত্তিকা নক্ষত্র ও সময় রাত্রিকাল।

এখন একে একে বিচার করা হবে।

১। ত্রয়োদশ তিথিতে আদ্যঋতুর ফল—পতিব্রতা নারী।
২। বৃহস্পতিবারে আদ্যঋতুর ফল—সুখ সৌভাগ্যশালিনী নারী।
৩। আষাঢ় মাসে আদ্যঋতুর ফল—ধনবতী নারী।
৪। পূর্ণা তিথিতে আদ্যঋতুর ফল—পুত্র কন্যাবতী।

৫। সিদ্ধিযোগে আদ্যঋতুর ফল—শুভ।
৬। কৃত্তিকা নক্ষত্রে আদ্যঋতুর ফল—দরিদ্রতা।
৭। রাত্রিকালে আদ্যঋতুর ফল—পতির মঙ্গলকারিণী।

আদ্যঋতুর ফলাফল বিচারে তার সবগুলিই শুভ কেবলমাত্র ষষ্ঠ অর্থাৎ নক্ষত্র স্থানে অশুভ। কিন্তু দরিদ্রতা দোষ বারফল, তিথিফল ইত্যাদির জন্য খন্ডন হয়ে যায়।

তাই সেই নারী পতিব্রতা, সৌভাগ্যবতী, ধনবতী, পুত্রকন্যাবতী ও পতির মঙ্গলকারিণী হবে।

ঋতুর সময়ে নিয়ম ও দিবস গণনাভেদের বিচার

মহাদেব বললেন—আদ্যঋতুর বিষয়ে তোমাকে অনেক কথাই বললাম। এবারে ঋতুকালীন নিয়ম ও ঋতুর পর বিভিন্ন দিনে নারীর কি বিভিন্ন নাম হয় তা বর্ণনা করছি, মন দিয়ে তা শোন। অর্থাৎ ঋতুর পর তিনদিন নারীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে এবং সেই তিনদিন নারী কার মত হয়ে থাকে তা বলছি শোন।

যেদিন নারীজাতি প্রথম ঋতুমতী হয় সেদিন তার নাম চন্ডালিনী, অর্থাৎ সেদিন সে চন্ডালিনী সদৃশা হয়ে থাকে।

ঋতুর পর দ্বিতীয় দিনে নারী মহাপাপীয়সী, তৃতীয় দিনে নষ্টস্বরূপা এবং চতুর্থ দিনে তপস্বিনী সদৃশা হয়।

ঋতুর পর চতুর্থ দিনে নারী স্নান করলে তারপর সে পবিত্রা হয়ে থাকে।

ঋতুর পর তাই তিনদিন স্নান করা নারীর নিষিদ্ধ—চতুর্থ দিনে স্নান করতে হয়। ঋতুর পর প্রথম দিনে নারীকে স্পর্শ করবে না—ওই দিন নারীতে উপগত হলে অতি অবশ্য পরমায়ু কমে যায়।

যদি দ্বিতীয় দিনে নারীগমন করা হয়, তাহলে মহাপাপীয়সী-স্পর্শে সে পুরুষকে মহাপাপে লিপ্ত হতে হয়।

তৃতীয় দিন নারীকে অবশ্য পরিত্যাগ করবে অর্থাৎ সেই দিন নারীকে স্পর্শ করলে সেই নারী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে এবং সেই পুরুষকেও বেশ্যাগমন পাপে লিপ্ত হতে হয়।

চতুর্থ দিনে নারী স্নান করে বিশুদ্ধ হলে তার পরে তাকে স্পর্শ করবে। কিন্তু চতুর্থ দিনেও প্রথম প্রহরে সে অগম্যা, তাতে গমনে জীবনী ক্ষয় হয়।

হে পার্বতি, এইভাবে তুমি যা যা শুনতে চাইলে সব বিষয়েই তোমাকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে শোনালাম। তুমি সবই আশা করি স্মরণ রেখেছ। এখন আর কি কি বিষয় তুমি শুনতে চাও আমার কাছে বল, আমি নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ চিত্তে তা তোমার কাছে বর্ণনা করব।

ঋতুমতী যদা নারী চন্ডালী প্রথমেহহনি।
পাপীয়সী দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে নষ্টরূপিণী ॥
তপস্বিনী চতুর্থে চ স্নাতা চৈব বিশুদ্ধতি।
প্রথমেহহ্নি অগম্যা চ গমনে জীবনক্ষয়ঃ ॥
মহাপাপ্না দ্বিতীয়ে স্যাৎ তৃতীয়ে রমণীং ত্যজেৎ।
অন্যথা সা চ নষ্টা স্যাৎ ইতি শাস্ত্রবিদাং মতং ॥

দশম পরিচ্ছেদ

নারীগমনের কালাকাল বিচার

সমস্ত বিবরণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন দেবী পার্বতী। তারপর বললেন—হে মহাত্মন, পদ্মপুরাণোক্ত রতিশাস্ত্রের বিষয়ে যা যা আপনি বর্ণনা করলেন, তা ছাড়া আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা বর্ণনা করুন।

কোন্ কোন্ দিন নারীগমন করা উচিত, কোন্ দিন উচিত নয়, গমন করলে কোন্‌দিন কি ফল হয়, আর দোষের জন্য নারীগর্ভে যে সন্তানের জন্ম হয়, সে কি প্রকার ফল পায় তা শ্রবণ করতে আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে।

হে দেব, যদি আমার প্রতি আপনার করুণাদৃষ্টি থাকে, তাহলে এই সমস্ত যথাযথভাবে আমার কাছে কীর্ত্তন করুন!

শ্রুতং পদ্মপুরাণোক্তং রতিশাস্ত্রং মহাত্মনা।
অশ্রুতং চাস্তি যচ্চৈব তদ্‌ব্রবীহি মহেশ্বরঃ॥
অগম্যাদিবসান্ ব্রুহি গমনে কিং ফলং ভবেৎ।
গমনাজ্জায়তে যোহসৌ কীদৃশো বা ভবিষ্যতি।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব যদি তে অস্তি কৃপাময়ি॥

শিব বললেন—হে দেবি, তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছ তা বলছি, মন দিয়ে শোন। হে দেবি, রতিশাস্ত্র সম্পূর্ণ জানতে পারলে তুমি যে পরম জ্ঞানবতী হবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যৎ পৃষ্টং সাম্প্রতং ত্বয়া।
রতিশাস্ত্রং বিদিত্বা ত্বং লহাজ্ঞানবতী ভবেঃ॥

নারীগমনের নিষিদ্ধ দিন

শিব বললেন—হে পার্বতি, চতুর্দশী, অষ্টমী, প্রতিপদ, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি, একাদশী এই সমস্ত দিন নারীগমনের পক্ষে বর্জনীয় জানবে।

এ ছাড়াও পিতৃশ্রাদ্ধদিন, যাত্রাকাল অর্থাৎ কোথাও যাত্রার সময়ে ও রবিবার—এই কয়দিনও নারীগমন বিবর্জনীয়।

এই সমস্ত দিনে ও সময়ে কখনও নারীসঙ্গ করবে না, তা করলে সদা কুফল ভোগ করতে হয় এবং বিপদগ্রস্ত হতে হয়। রতিশাস্ত্রে মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা এইরূপ নির্দেশ দিয়েছেন।

নারীগমনদোষে পুত্রকন্যার অবস্থা

শিব বললেন—হে দেবি, স্ত্রীগমনদোষেই পুত্রকন্যা দুঃখভোগী ও অল্পায়ু হয়ে থাকে বলে মনে রাখবে। সেই সব বিষয়েই বিস্তৃত বলা হচ্ছে।

বিবাহ হতে না হতেই অর্থাৎ কমল অপূর্ণ থাকলে সেই নারীর সঙ্গে সহবাস করলে যথাসময়ে সেই নারীর গর্ভে যে সন্তান হয়, সে দীর্ঘজীবী হয় না। অল্পদিন মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ থাকে তবে সে সময়ে তার নারীগমন করা উচিত নয়। যদি সেই গর্ভে কোনও পুত্রকন্যা জন্মে, তবে তারা চিরদিন দুঃখভোগ করে থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই সব কথা বিবেচনা করে নারীগমন করবে।

রাত্রির প্রহরভেদে নারীগমনের ফল ও সেই গর্ভে জাত সন্তানের অবস্থা

শিব বললেন—হে পার্বতি, রাত্রির প্রহরভেদে নারীগমন করলে যেরূপ ফল হয় এবং সেজন্য পুত্র ও কন্যা হলে তাদের যে অবস্থা হয়, তা বলছি শ্রবণ কর।

হে দেবি, রাত্রির প্রথম প্রহরে নারীগমন করলে তৎ-ঔরসে সেই নারীর গর্ভে যে সন্তান হয়, তা সে পুত্র বা কন্যা যাই হোক, তারা দীর্ঘজীবী হয় না। খুব অল্পদিনেই তাদের মৃত্যু হয়।

যে লোক রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে নারীগমন করে, তার ফলে পুত্র ব ন্যা যা হয়, তারা অবশ্য দীর্ঘদিন বাঁচে, কিন্তু তারা খুব দরিদ্র হয়—তারা সৌভাগ্য লাভ করে না।

হে মহেশ্বরি, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে যদি কোনও পুরুষ নারীগমন করে, তা হলে সেই নারীর গর্ভে যে কন্যা উৎপন্ন হয়, সে ব্যভিচারিণী এবং পুত্র হলে যারপরনাই অভাজন হয়। সেই দুর্জয় দুর্মতি পুত্র চিরদিন পরের দাস্যবৃত্তি করে কালযাপন করে থাকে।

যে ব্যক্তি রাত্রির চতুর্থ প্রহরে নারীগমন করে, তার হরিভক্তিপরায়ণ ধার্মিক সুপুত্র হয়।

হে প্রিয়ে, সুবুদ্ধিযুক্ত প্রতিটি মানুষ নিজের কল্যাণের জন্য এই সমস্ত শাস্ত্র বিশেষ পর্য্যালোচনা করে যথাযথ আচরণ করে থাকেন।

রাত্রেস্তু প্রথমে যামে ঋতুং রক্ষতি যো নরঃ।
তস্য পুনশ্চ কন্যা বা অচিরাৎ ম্রিয়তে ধ্রুবং ॥
গচ্ছেচ্চ কামিনীং কোহপি দ্বিতীয় প্রহরে যদি।
তস্য পুত্রশ্চ কন্যা চ ভজতে সুদরিদ্রতাং ॥
তৃতীয় প্রহরে যো হি নারীং গচ্ছেৎ স্বকামতঃ।
তনয়া তস্য নষ্টা চ পুত্রোস্ত্বভাজনঃ স্মৃতঃ ॥
কুমতি-দুর্জ্জনশ্চৈব দাস্যবৃত্তিং করোত্যসৌ।
চতুর্থ প্রহরে যো হি নারীং গচ্ছতি কামতঃ।
পুত্রো স লভতে মত্ত্যো হরিভক্তি পরায়ণং ॥

দিনের বেলা নারীগমনের ফল

শিব বললেন—হে পার্বতি, কি আর তোমার কাছে বর্ণনা করব বল—দিনের বেলা কোনও সময়েই কোনও পুরুষের নারী-বিহার করা উচিত নয়।

যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল চায়, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয়, তার পক্ষে দিনের বেলা কোনও সময়ই নারীগমন করা উচিত নয়।

দিনের বেলা নারীগমন করলে সেই গর্ভে যে পুত্র বা কন্যা হয়, তারা দুঃশীল, দুর্দান্ত, দুরাচার ও ধর্মহীন হয়ে থাকে—এতে কোনও অন্যথা নেই।

রতিশাস্ত্র অনুযায়ী এই বিধান একান্ত অমোঘ ও ধ্রুব, এটা মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য; তাই দিবাভাগে নারীগমন একান্ত বর্জনীয়।

আত্মকল্যাণকামী চ বুদ্ধিমান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ন ভবেচ্চ মহাদেবি দিবাগামী কদাচন।
গর্ভে তজ্জাতপুত্রশ্চ দুরাচারো ভবেদ্ ধ্রুবং ॥

ঋতুর চতুর্থদিন থেকে চতুর্দশ দিন পর্য্যন্ত নারীগমনের ফল

এবারে মহাদেব একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে বর্ণনা করতে উদ্যত হলেন। তা হলো ঋতুর চতুর্থ দিন থেকে চতুর্দশ দিন পর্যন্ত নারীগমনে কি ফলাফল হয়। সেই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা করলেন তিনি।

কোন্ দিনে নারীগমন করলে তার গর্ভস্থ সন্তানের কি অবস্থা হয়, তাও বর্ণনা করলেন তিনি।

ঋতুর শেষে চতুর্থ দিনে নারী স্নান করলে শুদ্ধা হয়।

এর আগে নারীগমন একান্তভাবে বর্জনীয়—তা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ দিনেও নারী প্রথম প্রহরে অগম্যা থাকে। কিন্তু পরবর্তী প্রহরে নারীগমন করলে সেই গর্ভে যে পুত্র হয়, সে পরম ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকে।

ঋতুর পর পঞ্চম দিনে নারীগমন করলে যদি সেই গর্ভে কোনও কন্যা উৎপন্ন হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে কন্যা অসদাচারী, অধার্মিকা, চরিত্রহীনা, এমন কি কুলটা হতে পারে। এমন কি সে স্বকুলনাশিনীও হয়ে থাকে।

যদি কেউ মদনার্ত হয়ে ঋতুর পর ষষ্ঠ দিনে নারীগমন করে, তা হলে সেই গর্ভে যদি পুত্রের উৎপত্তি হয়, তবে সে মহাদরিদ্র ও ভিক্ষুক হয়। সারা জীবন তাকে দরিদ্রতার মধ্যে ও ভিক্ষা করে কাল কাটাতে হয়।

ঋতুর শেষে সপ্তম দিনে নারীবিহার করলে যদি সেই গর্ভে কন্যা জন্মে, তাহলে সেই কন্যা নিজ পতিকে পরিত্যাগ করে পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

যদি ঋতুর পর অষ্টম দিবসে কেউ স্ত্রীর সঙ্গে বিহার করে, তা হলে সেই গর্ভে যে পুত্র হয়, সে সুখী ও পরম ধার্মিক হয়।

ঋতুর পর নবম দিবসে যদি কেউ নারীগমন করে, তা হলে যদি কন্যা জন্মে, সেই কন্যা সতী, পতিব্রতা, সদাচারপরায়ণা হয়ে জীবন কাটায়।

যে পার্বতি, ঋতুর পরে দশম দিনে কেউ নারীবিহার করে, তা হলে সেই নারীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সেই পুত্র আজন্ম পরম সুখে দিন অতিবাহিত করে।

হে দেবি, ঋতুর পর একাদশ দিনে যদি কেউ রতিবিহার করে, তা হলে সেই গর্ভে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেই কন্যা কুলবতী ও ধর্মশীলা হয়ে থাকে।

ঋতুর পর দ্বাদশ দিনে স্ত্রীর সঙ্গে বিহারে সেইদিনে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র সত্যবাদী, ধার্মিক জিতেন্দ্রিয়, কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, দীর্ঘায়ু ও নিষ্পাপ হয়ে থাকে।

হে দেবি, ঋতুর পর ত্রয়োদশ দিনে যদি কেউ নারীগমন করে, তবে তার গর্ভে কন্যা উৎপন্ন হয়ে থাকে। সেই কন্যা জিতেন্দ্রিয়া, সদাচারপরায়ণা, সত্যভাষিণী ও প্রিয়বাদিনী হয়ে থাকে।

হে প্রিয়ে, ঋতুর পর চতুর্দশ দিবসে কেউ নারীবিহার করে, তাহলে সেই নারীর গর্ভে যদি পুত্রের জন্ম হয়, সেই পুত্র মহাসুখী ও বিচক্ষণ হয়ে থাকে, সন্দেহ নেই।

চতুর্দশ দিনের পর আর কোনও পুত্রকন্যা হয় না।

এইভাবে আমি সম্পূর্ণ রতিশাস্ত্র বিষয়ে বর্ণনা করলাম। আশা করা যায় প্রতিটি লোক সেই অনুযায়ী বিচার করে সব কর্মাদি নির্বাহ করবে।

স্নানান্তে চ চতুর্থেহহ্নি শুদ্ধা ভবতি সুন্দরী।
তদ্দিনে জায়তে পুত্রো ভবেদ্ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥
পঞ্চমে রমণীং গচ্ছেৎ মানবঃ কোহপি যদ্যপি।
তস্মাচ্চেৎ জায়তে কন্যা কুলটা কুলনাশিনী ॥
ষষ্ঠে চ রমণীং গচ্ছেৎ কামতো যদি কশ্চন।
তৎপুত্রো জায়তে ভিক্ষুর্ম্মহাদরিদ্র এব চ ॥
নারীগামী ভবেদ্ যোহি দিবসে সপ্তসংখ্যকে।
ভজতে তনয়া তস্য পতিং ত্যক্তান্যপুরুষং ॥
অষ্টমে রমণীং গচ্ছেৎ মানবো যদি কশ্চন।
সুখিনং ধার্ম্মিকং পুত্রং লভতে নাত্র সংশয় ॥
নবমে জায়তে যস্য তনয়া স্ত্রীসঙ্গতঃ।
সতী পতিব্রতা সা চ সদাচারপরায়ণা ॥
দশমে রমণীং গচ্ছেৎ কামতো যদি কশ্চন।
আজন্ম সুখিনং পুত্রো লভতে নরসত্তমং ॥
একাদশে রজোরক্ষাং যো করোতি পুমান্ প্রিয়ে।
ধর্ম্ম পরায়ণা তস্য কন্যা কুলবতী ভবেৎ ॥
পুরুষঃ ক্রিয়তে যশ্চ দ্বাদশে ভার্য্যয়া সহ।
পুত্রো স লভতে সত্যবাদিনং বিজিতেন্দ্রিয়ং।
বৈষ্ণবাচারসম্পন্নং দীর্ঘায়ুষমকল্মষং ॥

যদ্যপি জায়তে কন্যা ত্রয়োদশে মহেশ্বরি।
জিতেন্দ্রিয়া সদাচারা সুপ্রিয়া সত্যভাষিণী ॥
চতুর্দ্দশেহহ্নি হে দেবি! যো গচ্ছেৎ রমণীং নরঃ।
জায়তে তনয়স্তস্য মহাসুখী বিচক্ষণঃ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি রতিশাস্ত্র-প্রকীর্ত্তিতং।
জ্ঞাতা চৈব বিচার্য্যাথ নারীসঙ্গং সমাচরেৎ ॥

ঋতুচর্যা ও সহবাসের বিশেষ দোষে সন্তানের বিভিন্ন অবস্থাভেদ

শিব তারপর বললেন—হে কাত্যায়নি, ঋতুর কাহিনী এবং কি ভাবে সহবাস করা উচিত এ বিষয়ে তোমাকে বলছি শোন। সহবাসদোষে সন্তান যেমন হয় তা তোমাকে বলছি। সাংখ্য, স্মৃতি যাজ্ঞবল্ক্য, মনু ইত্যাদি ঋষিরা শাস্ত্রমত বিচার করে যা কিছু বলেছেন, তা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। শাস্ত্রের এইসব কথা শুনলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। সহবাসের দোষেই সন্তানের নানারূপ বিপদ উপস্থিত হয়।

ষোলদিন পর্যন্ত নারীর ঋতুকাল নিরূপিত হয়ে থাকে। এই ষোল দিনের মধ্যে প্রথম চারদিন, একাদশ ও ত্রয়োদশ দিন এই ছয়টি দিন গর্হিত অর্থাৎ খারাপ—অর্থাৎ এই ছয়দিন সহবাসের পক্ষে প্রশস্ত; এ ছাড়া অবশিষ্ট দশটি দিন সহবাসের পক্ষে প্রশস্ত জানবে।

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শঃ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ
তস্যামাদ্যশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ ॥

নারী ঋতুমতী হলে প্রথম দিনে চণ্ডালিনী স্বরূপা, দ্বিতীয় দিনে পাপীয়সী ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয় দিনে রজকিনী সমান হয়ে থাকে। এই তিনদিন কখনও নারীসহবাস করবে না।

তারপর চতুর্থ দিনে ঋতুস্নান করলে নারী বিশুদ্ধ হয়। তবে একটা কথা।

চতুর্থ দিনে নারী স্নান করে শুদ্ধিলাভ করে সত্য, কিন্তু সেই দিন সে পিতৃকার্য, কি দৈবকার্য কিছুই করতে পারে না। চতুর্থ দিনে পতিসহবাস করতে পারে বটে, কিন্তু পঞ্চম দিনের আগে পূর্ণ শুদ্ধ হয় না।

এ ছাড়াও পঞ্চপর্বে নারীসহবাস করা একান্তভাবে বর্জনীয়।

পঞ্চপর্ব হলো অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি। বুদ্ধিমান লোকেরা অবশ্যই এই কয়দিন নারীসহবাস বর্জন করে থাকেন।

প্রথমেহহনি চণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেহহনি শুধ্যতি।
পঞ্চপর্ব্বাণি সংত্যজ্য গচ্ছেন্নারীং সুবুদ্ধিমান্।

বিভিন্ন দিনে সন্তানভেদ

শিব তারপর বললেন—নারীগমন সম্পর্কে যেসব বিধান বললাম, তা ছাড়াও শাস্ত্রে আরও বিধান আছে।

যেমন প্রথম বিধান হলো ঋতুর পর চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ স্নানের পর নারী পতির কাছে যেতে পারে বটে, কিন্তু যে দিন মঘা কিংবা মূলা নক্ষত্র হয় সেদিন যত্নের সঙ্গে পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ সেইদিন কদাচ নারীগমন করবে না।

পূরং ভর্ত্ত শ্চতুর্থেহেহ্নি গচ্ছেন্নারী পতিব্রতা।
তথা মঘাঞ্চ মূলাঞ্চ যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

এবারে মহাদেব ভিন্নশাস্ত্র অনুসারে কোন্ দিন কি ধরণের সন্তানের জন্ম হয়; সে বিষয়ে বর্ণনা করলেন।

তিনি বললেন—ঋতুর চতুর্থ দিবসে গর্ভধারণ করলে সেই গর্ভে অল্পায়ু ও ধনহীন পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

পঞ্চম দিনে গর্ভ হলে কন্যা, ষষ্ঠ দিনে সুমধ্যম পুত্র হয়। সপ্তম দিনে গর্ভ হলে বন্ধ্যা কন্যা এবং অষ্টম দিনে গর্ভ হলে সেই গর্ভে ধনবান পুত্র উৎপন্ন হয়।

নবম দিনে গর্ভধারণ করলে সৌভাগ্যবতী কন্যা, দশম দিনে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করে থাকে।

একাদশ দিনে গর্ভ হলে অধার্মিক কন্যা এবং দ্বাদশ দিনের গর্ভে শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

ত্রয়োদশ দিনে গর্ভ হলে সেই গর্ভে মহাপাপীয়সী বর্ণসঙ্করকারিণী কন্যার উৎপত্তি হয়ে থাকে।

চতুর্দশ দিনে যে নারী গর্ভধারণ করে তার সেই গর্ভে ধর্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ আত্মবেদী ও দৃঢ়ব্রত পুত্র জন্মে।

পঞ্চদশ দিনে গর্ভ হলে পতিব্রতা কন্যা এবং ষোড়শ দিনে গর্ভধারণ করলে সেই গর্ভে সর্ব ভূতের আশ্রয় স্বরূপ পরম ধার্মিক, সুলক্ষণযুক্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মে। এই পুত্র বংশের সুনাম বৃদ্ধি করে—সারা দেশ সেই পুত্রের খ্যাতিতে ভরে ওঠে।

রাত্রৌ চতুর্থ্যাং পুত্রো স্যাদল্পায়ুর্ধনবৰ্জ্জিতঃ।
পঞ্চম্যাং পুত্রিণী ষষ্ঠ্যাং পুত্রো সুমধ্যমঃ॥
সপ্তম্যামপ্রজা যোষিদষ্টম্যামীশ্বরঃ পুমান্।
নবম্যাং সুভগা নারী দশম্যাং প্রবরঃ সুতঃ॥
একাদশ্যামধর্ম্ম্যা স্ত্রী দ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমঃ।
ত্রয়োদশ্যাং সুতাং পাপাং বর্ণসঙ্করকারিণীম্॥
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ আত্মবেদী দৃঢ়ব্রতঃ।
প্রজায়তে চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং পতিব্রতা।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ষোড়শ্যা জায়তে পুমান্॥

শাস্ত্রে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে স্বামী বা স্ত্রী রোগগ্রস্ত কিংবা দুঃখিতচিত্ত হলে সে অবস্থায় সহবাস করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ঠিক তেমনি দিনের বেলা এবং উভয় সন্ধ্যাকালে অর্থাৎ উষা এবং সায়ংকালে কখনো সহবাস করবে না।

অন্যান্য শাস্ত্রে এরূপও লেখা আছে যে, যেদিন নারীর প্রথম রজোদর্শন হয় সেই দিন থেকে চারদিন নারী অস্পৃশ্য থাকে, তারপর শুদ্ধ হয়। সকল বর্ণেরই এই প্রকার বিধি স্থির করা হয়েছে। এই ক'দিন নারী সব পরিত্যাগ করে একান্ত লজ্জিত ভাবে ঘরের মধ্যে অবস্থান করবে এই রীতি। তিনদিন এইভাবে থাকতে হবে যেন কেউ তাকে দেখতে না পায়।

একবস্ত্র পরে দীনভাবে মুখ নিচু করে অবস্থান করবে। কারও সঙ্গে বেশি বাক্যালাপ করবে না। হাত, পা, চোখ, সব স্থির করে চুপচাপ থাকবে—কাজকর্ম করবে না।

দিনের শেষে একবার মাত্র মাটির পাত্রে সামান্য অন্ন ভোজন করবে সে। মাটির ওপর সাবধানে শুয়ে থাকবে।

এইভাবে নিয়ম পালন করে নারীকে তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত করতে হবে।

চতুর্থ দিন প্রাতে সে স্নান করে ধৌত বস্ত্র পরিধান করে শুদ্ধিলাভ করবে।

তা ছাড়াও শাস্ত্রে তিথিভেদে পুত্রকন্যার জন্ম ও ভাগ্যফলভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

শাস্ত্রের ভাষায়—

ন মলিনাং ন রোগার্ত্তাং ন রোগার্ত্তো ন মলিনঃ।
ন দিবা ন সন্ধ্যায়োশ্চ গচ্ছেৎ শাস্ত্রবিদাং মতং।
রজোদর্শনতোহস্পৃশ্যা নার্য্যো দিনচতুষ্টয়ং।
ততঃ শুদ্ধক্রিয়াশ্চৈতাঃ সর্ব্ববর্ণেম্বয়ং বিধিঃ ॥
রজোদর্শনতো দোষাৎ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতান্তর্গৃহেবসেৎ ॥
একাম্বরাবৃতা দীনা স্নানালঙ্কারং বর্জ্জিতা।
মৌনিন্যাধোমুখী চক্ষুপাণিপাড্ডিরচঞ্চলা ॥
অশ্নীয়াৎ কেবলং ভুক্তং নক্তং মৃন্ময়ভাজনে।
স্বপেদ্ ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদবমহত্রয়ং।
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্র্যন্তে সচেলমুদিতে রবৌ ॥

তিথিভেদে পুত্রকন্যাভেদ

অমাবস্যা পূর্ণিমায় গর্ভে বিকলাঙ্গ সন্তান হয়।
প্রতিপদে সন্তান হলে রোগা হয়।
দ্বিতীয়ায় পুত্র হলে সে অল্পায়ু হয়ে থাকে।
চতুর্থীতে কন্যা স্বাস্থ্যবতী ও পঞ্চমীতে পুত্র দীর্ঘায়ু হয়।
ষষ্ঠীতে খ্যাতনামা ও বুদ্ধিমান পুত্র বা কন্যা হয়ে থাকে।

সপ্তমীতে দুঃখিনী কন্যা ও সপ্তমীতে কর্তব্যনিষ্ঠ পুত্র হয়।

অষ্টমী তিথিতে দুর্বল পুত্র বা কন্যার জন্ম হয় বলে শাস্ত্রে জানা যায়।

নবমী তিথিতে চরিত্রহীনা কামুকা কন্যা ও দশমীতে বলিষ্ঠ পুত্র হয়।

একাদশী তিথিতে সহবাস বিধেয় নয়—তাতে দুর্মুখ বা বংশের কলঙ্ককারী দুর্বল পুত্র কন্যা হয়।

দ্বাদশীতে সুদর্শন পুত্র ও ত্রয়োদশীতে সুবুদ্ধিমতী কন্যা হয়। চতুর্দশীতে মহাপাপী পুত্র বা পাপীয়সী কন্যা হয়।

ঋতু অবস্থায় কি কি বর্জ্জনীয়

দেবীকে উদ্দেশ্য করে মহাদেব তারপর বললেন—ঋতু অবস্থায় কি কি নারীকে বর্জন করতে হবে তাও শাস্ত্রে লেখা আছে।

নারী ঋতুমতী হলে প্রথম তিন দিন মধু মাংস ভোজন, গন্ধমাল্য আদি ধারণ, দিনের বেলা শয়ন, মুখে তামাক দেওয়া বা জর্দা খাওয়া, মুখ শোধন, গন্ধদ্রব্য ভক্ষণ, ভাল বেশভূষা ধারণ, কান্নাকাটি করা (রোদন), খাট বা পুষ্পশয্যাবিছানো খাটে শয়ন, পুষ্প-অলংকার ধারণ, অগ্নিকে স্পর্শ—এই সমস্ত কাজ করা তার পক্ষে নিষিদ্ধ।

এছাড়া পন্ডিতেরা আরও নানা নির্দেশ দিয়েছেন।

নারী ঋতুমতী হলে প্রথম তিনদিন চোখে অঞ্জন বা কাজল দিবে না। অঙ্গে তৈল বা ঐ ধরনের দ্রব্য মর্দন করবে না। স্নান, দীর্ঘক্ষণ বেড়ানো, স্থানান্তরে গমন, দশন ধাবন করবে না। এমন কি সূর্য বা গ্রহনক্ষত্র পর্যন্ত দর্শন বন্ধ করলে ভাল হয়।

ঋতু অবস্থায় শরীরের দিকে বিশেষ যত্ন দেওয়া কর্তব্য। শরীরে যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দৌড় দেওয়া, লাফ দেওয়া, দ্রুত চলাচল করা, সব নিষিদ্ধ। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করাও নিষিদ্ধ।

ঋতু অবস্থায় অঞ্জলি করে জলপানের কথা এবং মাটির খর্পে (পাত্রে) খাবার কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ পাত্রে খর্পে চ ভোজনং।
গন্ধমাল্যে দিবাস্বাপং তাম্বুলঞ্চাস্যশোধনং ॥
দগ্ধে শরীরে ভুঞ্জীত পেয়ং নাঞ্জলিনা পিবেৎ।
আহারং গোরসানাঞ্চ পুষ্পালঙ্কারধারণং ॥
অঞ্জনং রোদনং গন্ধপীঠশয্যাদিরোহণং।
অগ্নিসংস্পর্শনং চৈব বর্জ্জয়েচ্চ দিনত্রয়ং ॥
অঞ্জনাভ্যঞ্জনে স্নানং প্রবাসং দন্তধাবনং।
ন কুর্য্যাৎ সার্ত্তবা নারী গ্রহণাং দর্শনং তথা ॥

নারী-মিলনের কতকগুলি বিধি ও নিয়ম

শাস্ত্রান্তরে আরও যে সব বিধি-নিষেধ আছে মহাদেব তা এবারে একে একে পার্বতীর কাছে ব্যক্ত করলেন।

ঋতুকাল থেকে প্রথম তিনদিন বাদে ষোড়শ দিবসের মধ্যে নারীগমনে সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু পর্ব ও চতুর্থ দিন পরিত্যাগ করা উচিত। এই সময়েই গর্ভধারণের উপযুক্ত কাল বলে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে।

যদি রজঃ নিবৃত্ত হয়, তাহলে চতুর্থ রাত্রিতেও নারী-মিলন চলতে পারে।

ঋতুমতী নারী তিন রাত্রি অশুচি বলে গণ্য হয়। এ সময় তার নয়নে অঞ্জন দান, ডুবে স্নান করা, দন্তধাবন, মাছ-মাংস ভক্ষণ এবং অপরের গৃহে যাওয়া বা নিজের শয্যা দর্শন করবে না। ওই কয়দিন তাম্রপাত্রে বা বামহাতে জলপান নিষিদ্ধ।

ঋতুকালে আপন নারী বা বিবাহিতা নারীতে উপগত হতে পারে—কিন্তু কখনও পরনারীতে উপগত হলে পরমায়ু হ্রাস পায়, ইহলোকে সকলের নিন্দা ও পরলোকে ঘোর পাপে নিমগ্ন হতে হয়—একথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

সকাম হলে ঋতু ভিন্ন অন্য সময়েও নারীগমন করা যায়। গর্ভবতী নারী যদি কামার্তা হয়, তাহলে প্রসবের পূর্বে পর্যন্তও পতিসহবাস করতে পারে, তাতে কোনওরূপ গর্ভহানির আশংকা নেই। কারণ এতে ইন্দ্রের বর আছে; তবে তা ধীরভাবে করা উচিত যাতে ব্যথা না পায়। অবশ্য গর্ভ অবস্থায় পাঁচমাস পর্যন্তই নারীগমন ভাল, যতো মাস বৃদ্ধি পায়, নারীগমন তত কম করা উচিত।

গর্ভবতী নারী অত্যন্ত কামার্তা হলে সে প্রসবের পূর্বে পর্যন্তও ধীরে পতিসহবাস করতে পারে—তাতে পুরুষকে দূষিত হতে হয় না।

জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, রোহিণী, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরফল্গুনী এই কয়টি নক্ষত্রে নারীগমন করবে, এছাড়া অন্য নক্ষত্রে নিষেধ আগে বলা হয়েছে।

যে কোন ঋতুর সময় নারীগমন না করে ঋতু ছাড়া অন্য সময়ে অগম্যা নারীতে উপগত হয় এবং যে লোক অযোনিতে গমন করে, তাকে পাপের ভাগী হতে হয়।

যদি পর্বদিনে কিংবা ঋতু ছাড়া অন্য সময়ে অনারোগ্য অবস্থায় নারীগমন করে, তবে তিন রাত্রি উপবাস করে তাকে শুদ্ধ হতে হয়।

অন্য নারীর প্রতি কামভাবে তাকান, তার সঙ্গে কামভাবে কথোপকথন করা অনুচিত; ইহা পাপ কার্য। ব্রাহ্মণেরা ঐরূপ কাজ করলে তাদের ব্রহ্মচর্য থেকে ভ্রষ্ট হতে হয়।

পিতামাতার শ্রাদ্ধদিনে নারীগমন করা কর্তব্য নয়। তাতে সেই সব শুভকর্মের ফল বিনষ্ট হয়।

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভক্ষণ করে নিজ নারী গমন করে, আর সেই নারীর ঔরসে যদি পুত্র জন্ম নেয়, তাহলে সেই পুত্র পূর্বের অন্নদাতা শূদ্রের মত বিপ্রকার্যাদিতে অনধিকারী হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

ঋতুমতী নারী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও লোক তাতে উপগত না হয় বা অন্য নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয় বা অন্য নারীর প্রতি কামভাব পোষণ করে, তাকে ভীষণ নরকে নিমগ্ন হতে হয়। সে ব্রহ্মঘাতীর সমান অপরাধে অপরাধী হয়।

তবে বিদেশে থাকার জন্য যদি স্বামী নিজ ঋতুমতী স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, তাতে দোষ হয় না।

৬—

ঋতুকালে নারীগমন করলে স্নানান্তে সেই পুরুষ শুদ্ধিলাভ করে। এটা শাস্ত্রের বচন। মলমূত্র ত্যাগের পর যেমন শৌচ করতে হয়, এক্ষেত্রেও তা করতে হবে। কি পুরুষ, কি নারী, শয্যা স্পর্শ করলেই অশুচি হয়। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করবার পর বস্ত্রত্যাগ ইত্যাদি করলে নারী শুদ্ধ হয়। কিংবা গঙ্গাজল গাত্রে ছিটিয়ে নেবে বা গঙ্গাস্নান করবে।

রাত্রির প্রথম ও শেষপ্রহরে নারীগমন করতে নাই, মধ্য অংশ অর্থাৎ রাত্রি নয়টা থেকে তিনটা পর্যন্ত এ কার্যের উৎকৃষ্ট সময় জানবে। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহর শাস্ত্র আলোচনাদি করে কাটাতে হবে।

যে লোক এই সব আচরণ ঠিক শাস্ত্রনিয়ম অনুসারে পালন করে, সে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং মৃত্যুর পরও সে মোক্ষলাভ করে সন্দেহ নাই।

নাস্তিকতা বা আলস্য বশে এসব নিয়ম না মানলে তাকে ঘোর নরকে গমন করতে হয়। নরক ভোগান্তেও তার মুক্তি হয় না।

তারপর সেই ব্যক্তি পশুযোনিতে গমন করে জন্মজন্মান্তর ধরে কষ্ট পায়।

ষোড়শর্ত্তুনিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচর্য্যেব পর্ব্বণ্যাদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়েতাত্রাপি চায়ুষঃ।
ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ ॥
যথোক্তদোষহীনেষু সকামেম্বনৃতাবপি।
প্রৌঢ়গর্ভামপি অত্যন্তকামামুপেয়াৎ ॥
জ্যেষ্ঠ মূলা মঘাশ্লেষা রেবতী কৃত্তিকাশ্বিনী।
উত্তরাত্রিত্রয়ং ত্যক্ত্বা পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেদৃতৌ ॥
ঋতৌ নোপৈতি যো ভার্য্যামনৃতৌ যশ্চগচ্ছতি।
তুল্যমাহুস্তয়োর্দ্দোষানযোনৌ যশ্চ গচ্ছতি ॥
পর্ব্বানারোগ্যবর্জ্জমৃতাবগচ্ছন্ পত্নীস্ত্রিরাত্রমুপবসেৎ।
স্ত্রীণাং সংপ্রেক্ষণাৎ স্পর্শাং তাভিঃ সংকথনাদপি ॥
ব্রহ্মচর্য্যং বিপদ্যেত ন দারেম্বর্তুসঙ্গমাৎ।
শ্রাদ্ধাহনি তু নিষেধঃ ॥
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোহধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা জায়ন্তে শূদ্রবদ্দ্বিজাঃ ॥
ঋতুস্নাতাং চ যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নাধিগচ্ছতি।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং ব্রহ্মহেতি তথোচ্যতে ॥
ঋতৌ তু গর্ভাশঙ্কিত্বাৎ স্নানং মৈথুনিনঃ স্মৃতং।
অনৃতৌ তু তদা কার্য্যং শৌচং মূত্রপুরীষবৎ ॥

দ্বাবেতাবশুচী স্যাতাঃ দম্পতি শয়নং গতৌ।
শয়নাদুত্থিতা নারী শুচিঃ স্যাচ্চ শুচিঃ পুমান্ ॥
প্রদোষ পশ্চিমৌ যামৌ বেদাভ্যাসেন বৈ নয়েৎ।
যামদ্বয়ং শয়ানস্তু ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ইত্যেতদক্ষিলং প্রোক্তং অহোরাত্রাশ্রিতং ময়া।
ব্রাহ্মণানাং কৃত্যমেতদপবর্গফলপ্রদং ॥
নাস্তিক্যাদথবালস্যাদ্ ব্রাহ্মণো করোতি চ যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং পশুযোনৌ চ জায়তে ॥

নারী মিলনের সমস্ত বিধি ও নিয়ম বেশ ভাল করে বর্ণনা করলেন মহাদেব। তারপর পার্বতীর প্রশ্নে তিনি শিশুর অকালমৃত্যু বা বিকৃত অঙ্গের কারণ কি, তা একে একে বর্ণনা করলেন।

শিশুর জন্মের পর তার অকালমৃত্যু ও বিকৃত অঙ্গের কারণ

শিব বললেন—দেবি, নারীসহবাসের দোষেই তাদের সন্তানগণ অকালে মৃত্যুকে বরণ করে এবং তারা কখনও বিকৃতাঙ্গও হয়ে থাকে।

তার কারণ কি একে একে বলছি, মন দিয়ে শোন।

আগেই বলা হয়েছে, তিথিভেদে সন্তানের ভেদ হয়। কিন্তু তার মধ্যে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নারী সহবাস নিষিদ্ধ। তার কারণ, ওই দুটি দিন মানুষের দেহে রসের আধিক্য হয়। সেইজন্যে শুক্রের উপাদানেও রস বেশি সঞ্চারিত হয়।

সুতরাং যদি সেই শুক্রের দ্বারা গর্ভের সঞ্চার হয় এবং সেই গর্ভে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহলে সেই সন্তানও যে দুর্বল ও অপূর্ণ হবে তাতে আর বিচিত্র কি?

ঠিক তেমনি একাদশী দিনেও শরীরে বেশি রসের প্রাবল্য হয়।

ঠিক অমাবস্যা পূর্ণিমার মতো একাদশী তিথিতেও কোনও সময় সহবাস বিধেয় নয়।

শিশু দুর্বল জন্ম নিলে তার অকালমৃত্যু ঘটে। আর জন্ম থেকেই বিকৃতও হয় অনেক সন্তান।

অমাবস্যা তথা পূর্ণা রসাধিক্যবিধায়িনী।
তদা শুক্রোপদানে চ রসাধিক্য ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তেন চেজ্জায়তে পুত্রো দুর্ব্বলোহপূর্ণা ভবেৎ ॥

শিব বললেন—হে পার্বতি, এছাড়াও আয়ুর্বেদে আরও নানা কথা লিখিত আছে যা ঋতুমতী নারী কি গর্ভবতী নারীর অতি অবশ্য মেনে চলা কর্তব্য।

গর্ভবতী নারীর অতিরিক্ত পরিশ্রম করা কদাচ উচিত নয়। তীক্ষ্ণদ্রব্য ভোজন, উষ্ণদ্রব্য আহার, গুরু ভোজন, দিবানিদ্রা, শোক, দুঃখ, ভয়, অতিরিক্ত রাত্রি জাগা কখনও উচিত নয়।

এ ছাড়াও গর্ভ-অবস্থায় উপবাস, কোনও অতিরিক্ত ভারী বস্তু বহন করা, বিকৃত পদার্থ দর্শন, চিৎ হয়ে শোওয়া, ক্রোধ, অতিরিক্ত ভ্রমণ, যানবাহনে আরোহণ, বিষম বা উঁচুনিচু স্থানে বসা—এই সব পরিত্যাগ করতে হবে।

যদি এগুলি না মানা যায় তবে গর্ভপাত বা গর্ভস্থ সন্তানের নানা রোগ ব্যাধি ও অকালমৃত্যু হতে পারে। শাস্ত্রের ভাষায়—

অতিশ্রমং ব্যায়ামঞ্চ তীক্ষ্ণোষ্ণঞ্চ গুরুভোজনম্।
শোকভয়ং দিবাস্বপ্নো নিশাজাগরণং তথা ॥
লঙ্ঘনং ভারবাহশ্চ তথা বিকৃতদর্শনম্।
উত্তানশিয়নং রোষো বহুপর্য্যটনং তথা ॥
যানদ্যরোহণঞ্চৈব বিষমে চোপবেশনম্।
এতৎসর্ব্বাণি ত্যজ্যানি গর্ভিণীভির্নসংশয়ঃ ॥
নিদানানি চ রোগাণাং সসূত-প্রসূতেরপি।
ঋতুমতী চ যা নারী বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বমেব হি।
অথবা রোগসংঘৈশ্চ পীড্যতে নাত্র সংশয় ॥

শিশুর অল্প আয়ু ও অপূর্ণ অঙ্গের আরও কারণ বর্ণিত হয়েছে শাস্ত্রে।

ঋতুর পর তিনটি রাত্রি নারীগমন শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, তা আগেই বলা হয়েছে। তার কারণ এই যে, এই তিনদিন সেই নারীর দেহে রক্ত অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়।

যদি সেই সময় নারী পতিসহবাস করে, তাহলে পুংবীজ অন্তঃপ্রবেশ করতে সমর্থ হয় না।

কিন্তু যদি কোনওভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তাহলে সে গর্ভে যে সন্তান হয়, সে অত্যন্ত রোগা হয়—তাই দীর্ঘজীবী হয় না। ভূমিষ্ঠ হবার পর অল্পদিনের মধ্যেই তারা মারা যায়।

যদি ঋতুর দ্বিতীয় দিনে সহবাস করে তাহলে পুরুষের পরমায়ু কম হয়, তজ্জাত সন্তান সূতিকাগৃহেই মারা যায়। এটা শাস্ত্রের বচন।

তৃতীয় দিনে সঙ্গম করলে যদি সেই গর্ভে সন্তান হয়, তাহলে সে অপূর্ণাঙ্গ হয়।

চতুর্থ দিন থেকে ষোড়শ দিন পর্যন্ত সহবাস উত্তরোত্তর ভাল হয় বলে জানা যায়।

নবম দিনের পর সন্তান সুগঠিত, বলিষ্ঠ, বলবীর্যশালী ও পূর্ণ অঙ্গ হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

ঋতুমতী চ যা নারী ত্রিরাত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ।
পতিসংঙ্গং সযত্নেন কারণং শৃণু তত্ত্বতঃ ॥

বেগেন বহতে দেহে শোণিতং নাত্র সংশয়ঃ।
কৃতে সঙ্গে তু বীজঃ বৈ ন চান্তঃ প্রতিশেদ্ ধ্রুবম্ ॥
প্রথমেহহ্নি কৃতে সঙ্গে স্বল্পায়ু পুরুষো ভবেৎ।
তজ্জাত তনয়শ্চাপি ম্রিয়তে সোহচিরাদ ধ্রুবম্ ॥
দ্বিতীয়েহহ্নি কৃতে সঙ্গে তৎফলং সনবাপ্নুয়াৎ।
সূতিকামন্দিরে চৈব গতাসুঃ সন্ততির্ভবেৎ ॥
তৃতীয়েহহ্নি কৃতে সঙ্গে স্বল্পায়ু সোহপি চার্ভকঃ।
সুশ্রুতবচনঃ হ্যেতৎ সম্পূর্ণাঙ্গশ্চ নো ভবেৎ।
উত্তরোত্তদিনে তু গর্ভাধানং প্রশস্যতে ॥

এছাড়া (সুশ্রুতের বাক্যগুলি বা উপদেশগুলি ছাড়া) নারীর ঋতু ও গর্ভকালের বিষয়ে আরও নানাকথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

মহাদেব সেগুলি এবারে দেবী পার্বতীর কাছে ব্যক্ত করলেন।

নারীজাতি ঋতুমতী হলে তিনদিন গায়ে তৈল দেবে না, নখচ্ছেদ, রোদন, নেত্রে অঞ্জন দান, দিবানিদ্রা, স্নান ও গায়ে গন্ধদ্রব্য প্রদান, অতি উচ্চৈঃস্বরে হাসা, বহু কথা বলা, কেশবিন্যাস, উঁচুশব্দ শোনা, বাতাস খেয়ে বেড়ান, বেশি কাজকর্ম, এ সবই পরিত্যাগ করতে হবে।

নারী যদি ঐ সব কাজ করে তবে তার শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে নানাধরনের রোগ উৎপাদন করতে পারে।

বিশেষ করে ঋতু বা গর্ভকালে উপবাস, মলমূত্রের বেগ চেপে রাখা অত্যন্ত খারাপ। এতে রক্তগুল্ম ইত্যাদি রোগ হয় এবং তাতে সেই নারীর সন্তান অকালে মারা যায়।

তৈলভ্যঙ্গং নখচ্ছেদমঞ্জনং রোদনং তথা।
দিবানিদ্রাং তথা স্নানং গাত্রে গন্ধানুলেপনম্ ॥
অতিহাস্যং বহুবাক্যং কেশবিন্যাসমেব চ।
উচ্চৈঃস্বরশ্রবণঞ্চ বহুবায়ুনিষেধণম্ ॥
ঋতুমতী চা যা নারী বহুশ্রমঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
শোণিতং দূষয়িত্বা চ সর্ব্বঃ বৈ রোগকারণম্ ॥
বিশেষেণ তু বক্ষ্যামি শৃণু দেবি মহাব্রতে।
ঋতুকালে চ য নারী মূত্রাদিবেগধারণম্।
অথবা লঙ্ঘনং কুর্য্যাদ যথা পতিসঙ্গমম্ ॥
পীড্যতে সা মহাদেবি রক্তগুল্মাদি পীড়য়া।
সন্ততিরপিচাল্পায়ুরিদং চরকভাষিতম্ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ

জারজ নির্ণয়

রতিশাস্ত্র অনুসারে কোনও ব্যক্তি তার পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে কি না তা বিচার করবার সুন্দর পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বিশেষ করে কোন লোকের সহিত বিবাহাদি সম্পর্ক স্থির করতে হলে সে সদ্বংশজাত কি না যেমন দেখা প্রয়োজন— তেমনি সে পিতার ঔরসজাত প্রকৃত সন্তান কি না তাও জানা একান্তভাবে প্রয়োজন।

কোনও লোক সুজাত কি না এমন একটি প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে জিজ্ঞাসিত সময়ে কি যোগ এবং তা কোন্ সংখ্যার যোগ সেই সংখ্যাটি গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্জিকা দেখে সেই সময়ের যোগ নির্ণয় ও তার সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সাতাশটি যোগ দেখা যায়। সেগুলি হলো—বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক, ব্যতীপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সিদ্ধ, সাধ্য, শুভ, শুক্র, ব্রহ্ম, ইন্দ্র ও বৈধৃতি। যোগের ঐ সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করে গুণফলে চৌদ্দ যোগ করতে হবে।

সেই যোগফল তিন দিয়ে ভাগ করে ফলাফল নিরূপণ করতে হবে। সেইভাবে ভাগ করে যদি এক ভাগশেষ থাকে তাহলে সেই লোক সুজাত অর্থাৎ পিতার ঔরসে জাত বলে নির্ণীত হবে। যদি দুই ভাগশেষ থাকে তবে সে জারজ অর্থাৎ অপর লোকের বীর্যে তার জন্ম বুঝতে হবে।

যদি কিছু ভাগশেষ না থাকে, তবে তার পিতার ঔরসে জন্ম হবার সম্ভাবনা বেশি বলে বোঝা যাবে।

ভালভাবে বিষয়টি বোঝাবার জন্যে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

হরেনবাবু নামে এক ভদ্রলোক নিজের মেয়ের জন্যে পাত্র দেখতে গেছেন।

তিনি জ্যোতিষী পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন—আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, যদুনাথের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে স্থির করতে চাই না। ছেলেটি কেমন বা সম্বন্ধে কেমন হবে বলুন। গণনা করে স্থির করে আমাকে বলবেন।

হরেনবাবুর মনের কথা পণ্ডিত বুঝে নিলেন। তিনি জানতে চান যদুনাথ ছেলেটি পিতার ঔরসে জন্মেছে, না সে জারজ তা তিনি জানতে চান।

জ্যোতিষী পণ্ডিত পঞ্জিকা খুলে ফেললেন। দেখতে পেলেন তখন ধ্রুবযোগ চলেছে। ধ্রুবযোগের সংখ্যা ১২ অর্থাৎ পর পর সাতাশটি যোগ গণনা করলে ধ্রুবযোগ ১২ নম্বরে পড়ে। সুতরাং সেই ১২কে ৫ দিয়ে গুণ করে গুণফল হলো ৬০, সেই ৬০-এর সঙ্গে ১৪এর যোগফল হলো ৭৪। ৭৪-কে তিন দিয়ে ভাগ করলে ২ ভাগশেষ থাকে, অর্থাৎ যদুনাথের জন্ম তাঁর পিতার ঔরসে হয়নি।

পন্ডিত গণনা করে বুঝতে পারলেন পাত্রটি জারজ সন্তান অর্থাৎ তার পিতার ঔরসজাত নয়।

কিন্তু একজন ভদ্রলোকের ছেলের নামে হঠাৎ এ রকম মন্তব্য করা উচিত নয়। তা ছাড়া যদুনাথের পিতা বেশ ধনী লোক।

অথচ হরেনবাবু তাঁকে ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। তাঁর মেয়ে রমাকেও তিনি স্নেহ করেন। এ অবস্থায় রমা একজন চরিত্রহীনা শাশুড়ীর হাতে পড়ে কষ্ট ভোগ করবে?

তখন জ্যোতিষী পন্ডিত হরেনবাবুর কাছে একটি মিথ্যা কথা বলে আত্মরক্ষা করলেন। তিনি বললেন—আমি ঠিক গণনা করে উঠতে পারছি না। আপনি বরং একজন বিজ্ঞ পন্ডিতকে দিয়ে গণনা করিয়ে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করুন।

হরেনবাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি জানেন জ্যোতিষশাস্ত্রে ও রতিশাস্ত্রে পন্ডিতের ভাল জ্ঞান আছে। পন্ডিত নিশ্চয়ই কৌশলে আত্মরক্ষা করলেন।

তিনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে চলে গেলেন এবং তারপর জারজ সন্তান যদুনাথের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ কৌশলে ভেঙ্গে দিলেন।

শাস্ত্রের ভাষায়—

রতিশাস্ত্রানুসারেণ জারজশ্চ নিরূপ্যতে।
প্রশ্নমেকং সমাশ্রিত্য গৃহ্ণীয়াদ্ যোগমেককম্ ॥
যোগং পঞ্চগুণীকৃত চতুর্দ্দশেন যোজয়েৎ।
ত্রিভির্হৃত্বা চ শেষেণ ফলাফলং নিরূপ্যতে ॥
এক শেষেণ জানীয়াৎ পিত্রা জাতঃ স পুরুষঃ।
দ্বিশেষেণ জারজস্তু সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
শূন্যেন চান্ধবীর্য্যেণ ইতি শাস্ত্রবিদাং মতম্ ॥

জারজ নির্ণয়ের আরও একটি সুপদ্ধতি প্রচলিত আছে।

কোন লোক জারজ কিংবা সুজাত কিনা তা অবগত হবার জন্যে যে দন্ডে প্রশ্ন উপস্থিত হবে সেই দন্ডের সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণফলে তিথি, বার ও নক্ষত্রের সংখ্যা একে একে যোগ করবে।

যে সমষ্টি হলো তাকে প্রশ্নকালীন লগ্ন বা রাশির সংখ্যা দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ভাগ করবে সেই মাসের সংখ্যা দিয়ে—অর্থাৎ চৈত্র মাসের থেকে এক ধরে ফাল্গুন পর্যন্ত দ্বাদশ ধরে ভাগ করতে।

এই প্রকার ভাগ করে যদি ভাগশেষ সমাঙ্ক বা জোড় সংখ্যা হয় তবে সে লোক সুজাত। যদি ভাগশেষ বিষমাঙ্ক বা বিজোড় হয়ে থাকে তবে সে জারজ। শূন্য শেষ হলেও পিতৃ-ঔরসে জন্ম ধরতে হবে।

এই গণনা ভাল করে বোঝাবার জন্যে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো এখানে।

মনে ধরা যাক, শ্রাবণ মাসে পঞ্চমী তিথি, বুধবার, কৃত্তিকা নক্ষত্র, সিংহ রাশি, বেলা পাঁচ দন্ডের সময় কোন লোককে বলা হলো দয়া করে বলুন যদুনাথ সুজাত কি না।

পন্ডিত প্রথমে পাঁচ দন্ডকে পাঁচ দিয়ে গুণ করে পেলেন পঁচিশ—এই সংখ্যার সঙ্গে বুধবারের সংখ্যা ৪, কৃত্তিকা নক্ষত্রের ৩, পঞ্চমী তিথির সংখ্যা ৫, যোগ করে পেলেন ৩৭।

এখন লগ্ন সিংহ অর্থাৎ ৫। ৩৭-কে পাঁচ গুণ করে তিনি সংখ্যা পেলেন ১৮৫। তাকে শ্রাবণ মাসের সংখ্যা ৪ দিয়ে ভাগ করে দেখলেন অবশেষে আছে ১। ১ বিষমাঙ্ক বা বিজোড় সংখ্যা—সুতরাং এ গণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যদুনাথ জারজ সন্তান।

এইভাবে মহাদেব কথিত রতিশাস্ত্র অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে জারজ নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নদন্ডং সমাশ্রিত্য পঞ্চগুণীকৃতং ভবেৎ।
ফলেন তিথিবারৌ চ নক্ষত্রঞ্চৈব যোজয়েৎ ॥
সমষ্টিনা প্রশ্নলগ্নং গুণীকৃতং ফলং লভেৎ।
চিত্রাদি ক্রমতো মাসৈরেকদ্বাদশভিস্তথা ॥
হৃত্বা চ ভাগশেষেণ জারজঞ্চ পরীক্ষয়েৎ।
সমাঙ্কেন সুজাতশ্চ বিষমে জারজো ধ্রুবং।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সতী ও অসতী নির্ণয়

জারজ নির্ণয়ের পর মহাদেব তাঁর রতিশাস্ত্রে আর একটি প্রধান বিষয় বর্ণনা করলেন, তা হলো সতী কি অসতী নির্ণয়।

একে একে মহাদেব সেগুলি বর্ণনা করলেন দেবী পার্বতীর কাছে। যদি কোনও লোক তার পুত্রের বিবাহ দিতে চায়, তবে যে নারীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হচ্ছে তার শুভ লক্ষণ ও অলক্ষণ যেমন বিচার করতে হয়, তেমনি সেই নারী সতী বা অসতী তাও বিচার করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

মহাদেব বলতে লাগলেন—যে নারীর গতি মরালের মত, যার দুটি চোখ দীর্ঘ ও মনোহর, যে নারী চলবার সময় ঘন ঘন বাঁ দিকে কটাক্ষপাত করে সেই নারী সতী ও পতিপ্রিয় হয়ে থাকে।

যে নারীর বাঁ চোখে বা বাঁ উরুতে তিলচিহ্ন থাকে এবং যার কণ্ঠস্বর মধুর বা বাঁশীর মত মিষ্ট, সেই নারী সতী ও পতিপ্রিয়া হয়ে থাকে কোন সন্দেহ নাই।

মরালগামিনী নারী সুচারুদীর্ঘলোচনা।
বামে মুহুর্নিরীক্ষন্তি সা সতী পতিবল্লভা॥
বামেঽক্ষি তিলকং যস্যা বামোরৌ তিলকং যদি।
সতী পতিব্রতা চৈব্য কলকণ্ঠনিনাদিনী।

মহাদেব তারপর বললেন—বিবাহের সম্বন্ধকালে যখন কন্যা দর্শন করবার জন্যে যাত্রা করা হয়, যদি সেই সময় হঠাৎ মেঘগর্জন হয়, তা হলে সেই কন্যা বিবাহের পর নিঃসন্দেহে কুলটা হবে—সে নিজ পতি পরিত্যাগ করে অপরের কাছে যাবে, এতে কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু এখানে একটা কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে। তা হলো যদি আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ বর্ষাকালে মেঘগর্জন হয় তাতে কোনও দোষ নেই; যদি অকালে মেঘগর্জন হয় তা হলেই তা দোষ বলে গণ্য করা হবে।

কন্যাদর্শনযাত্রায়াং জীমূতগর্জ্জনং যদি।
বহুনা কিমিহোক্তেন কুলটা সা পতিং ত্যজেৎ॥

যে নারী উত্তরাষাঢ়া বা শতভিষা নক্ষত্রে জন্মায়, সে নিশ্চয়ই পতিভক্তি-পরায়ণা সতী হবে। তার চরিত্র আদর্শস্থানীয়া হবে—অর্থাৎ তার চরিত্র দেখে অন্য মেয়েরা পতিভক্তি ও আদর্শ চরিত্রের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

হাঁটবার সময় যে নারীর পাদবিক্ষেপে মা বসুমতী কম্পিতা হন, অর্থাৎ যে সবেগে পাদক্ষেপ করতে করতে চলে, সে নারীকে পরিত্যাগ করবে। তাকে বিবাহ করলে সে নিশ্চয়ই নিজ স্বামী পরিত্যাগ করে অন্য পুরুষের সঙ্গে গমন করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

বৈশ্যে বা বারুণে জাতা নারী পতিপরায়ণা।
তদাদর্শমনুপ্রাপ্য সতীত্বমভ্যসেৎ সদা ॥
যস্যাশ্চরণবিক্ষেপৈঃ কম্পতে বসুধা সদা।
বর্জ্জনীয়া যতঃ সা হি স্বপতিং ত্যজতি ধ্রুবম্ ॥

মহাদেব তারপর সতী অসতী নির্ণয়ের বিষয়ে আরো কতকগুলি কথা বললেন।

তিনি বললেন—শোন পার্বতি, যে নারী আজন্ম ধবলা অর্থাৎ যার দেহ শ্বেতবর্ণ (ফর্সা নয়—ধবল রোগযুক্ত) অথবা দেহের কোনও স্থানে শ্বেতচিহ্ন বর্তমান থাকে তাকে বিবাহ করা কখনও উচিত নয়।

তাকে বিবাহ করলে অল্পদিনের মধ্যেই সে বিধবা হবে। তারপর সে দ্বিতীয় পতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

যখন কন্যা দর্শনের জন্যে যাত্রা করা যায়, তখন যদি দেখা যায় যে, শকুনি, কাক বা চিল উর্দ্ধ আকাশ থেকে বা উচ্চ স্থান থেকে নিচে পড়ছে তাহলে জানবে ঐ কন্যার সঙ্গে সেই ব্যক্তির বিবাহ দেওয়া কখনই উচিত নয়।

এই কন্যাকে গ্রহণ করলে সে যে নিশ্চয়ই কুলটা হবে বা বিয়ের আগে থেকেই সে যে চরিত্রহীনা হবে, এ কথা ধ্রুব জানবে।

আজন্মধবলা নারী চিহ্নং বা ধবল ক্বচিৎ।
পতিং হন্তাচিরেণৈব দ্বিতীয়া বৈ ভজেৎ পতিম্ ॥
কন্যাদর্শনযাত্রায়াং গৃধ্রবায়সচিল্লকাঃ।
উর্দ্ধাদধঃ পতন্ত্যাশু বর্জ্জ্যা সা কুলটা যতঃ ॥

যখন কন্যা দর্শনের জন্য যাত্রা করা যায় অথবা যে সময় কন্যা প্রথম দেখতে পাওয়া যায়, যদি সেই সময় সুগন্ধপূর্ণ মৃদু মৃদু পবনহিল্লোলে দশদিক পূর্ণ হয়, তাহলে সেই কন্যা যে সতী ও ভাগ্যবতী হবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

যখন কন্যা দর্শনের জন্য যাত্রা করা যায়, যদি সেই সময় অল্প অল্প বৃষ্টিধারায় ধরিত্রী অভিসিঞ্চিত হয় আর মেঘগর্জন বা তেমন কোন শব্দ না থাকে, তবে বিয়ের পরে সেই কন্যা সতী ও পতিব্রতা হবে এ কথা নিশ্চিত। শাস্ত্রের এই বাক্য কখনও মিথ্যা কথা হতে পারে না।

মারুতৈঃ পূর্য্যমাণা দিক্ সুমন্দমৃদুগন্ধিভিঃ।
সা সতী ভাগ্যবতী চ যদি কন্যা নিরীক্ষণে ॥
মন্দ-মন্দাম্বুপাতেন নিষিক্তং ভূতলং যদি।
স্তম্ভিতং গর্জ্জিত নৈব সা সতী পতিবল্লভা ॥

যখন কন্যা দর্শন করতে যাত্রা করবে, তখন একমুঠি তণ্ডুল (চাল) হাতে নিয়ে প্রজাপতি দেবতাকে স্মরণ করে ভূতলে নিক্ষেপ করতে হবে। যদি একটিও চাল হাতে না লেগে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে সেই কন্যা পতিব্রতা ও সতী হবে। যদি দু'একটা চাল হাতে লেগে থাকে, তবে সেই কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির না করা ভাল।

অবশ্য হাত যেন ঘামে বা জলে ভেজা না থাকে তা দেখতে হবে এবং চালটি হাতে চেপে ধরবে না। আলগোছে চালটি নিয়ে ফেলে দিয়ে দেখতে হবে।

তণ্ডুলমুষ্টিমাগৃহ্য ক্ষিপেৎ প্রজাপতি স্মরণ্।
যদি লগ্ন করে নৈব তদা কন্যা পতিব্রতা ॥

যে নারীর নামের অক্ষর-সংখ্যা যুগ্ম অর্থাৎ জোড় এবং যে গ্রামে সে বাস করে সেই গ্রামের অক্ষর সংখ্যা যুগ্ম অর্থাৎ জোড় দেখা যায়, তেমন নারী অসতী ও পতিবিদ্বেষকারিণী হয়ে থাকে।

কিন্তু যদি একটি জোড় ও একটি বিজোড় হয়, তবে তা ভাল লক্ষণ সন্দেহ নাই। দুটি বিজোড় হওয়াও ভাল।

যুগ্মনামাক্ষরা যা তু গ্রামশ্চেদ্‌যুগলাক্ষরঃ।
প্রায়েণ তাদৃশী নারী প্রতিবিদ্বেষকারিণী ॥

কোন কন্যা সতী হবে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য অবশ্য রতিশাস্ত্রসম্মত আর একটি পদ্ধতি আছে।

কন্যা সতী হবে কিনা তা পরীক্ষা করতে হলে তাকে যথাক্রমে এক দুই ইত্যাদি শতাধিক গণনা করতে বলবে।

গণনাকালে গণনা করতে করতে যুগ্ম অংক গণনার সময় যদি বাক্য স্খলিত হয় আর অযুগ্ম অংক সুস্পষ্ট বলে, তাহলে সে কন্যা প্রায়ই পতিব্রতা হয় না। কিন্তু এর বিপরীত হলে সে প্রায়ই পতিব্রতা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ একটি কন্যাকে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গণনা করতে বলা হলো। যদি সে গোণবার সময় দুই, চার, ছয়, আট প্রভৃতি জোড় সংখ্যাগুলি গণনার

সময় থতমত খায় এবং এক, তিন, পাঁচ প্রভৃতি অযুগ্ম সংখ্যা ভালভাবে গণনা করে, তাহলে এর পতিব্রতা হবার আশা কম।

কিন্তু এর বিপরীত হলে অর্থাৎ দুই, চার প্রভৃতি যে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে, সে প্রায়ই সতী হয়।

একাদিগণনায়াত্তু যুগ্ম স্খলিতবাদিনী।
অযুগ্মে ত্বরিতা চৈব কদাপি সা পতিব্রতা ॥

যে কন্যা পুরুষকে দেখলে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে কিন্তু কোন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলে তার প্রতি সেভাবে একদৃষ্টে তাকায় না, সেই নারী পরিত্যজ্যা—তেমন রমণী যে নিশ্চতই অসতী হবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারা যায়।

আলোক্য পুরুষং বালা নিমেষহীনলোচনা।
নারীং দৃষ্ট্বা নৈব সা কন্যা ব্যাভিচারিণী ॥

যদি কোন কুমারীর নাম দেবসংজ্ঞক, বৃক্ষসংজ্ঞক, নদীসংজ্ঞক, পুষ্পসংজ্ঞক বা এ ছাড়া অন্য কোন বস্তুসংজ্ঞক হয়ে থাকে, তাহলে সেই নামের সঙ্গে যথাক্রমে দুই, তিন, পাঁচ, ছয়, সাত যোগ করতে হবে। অর্থাৎ দেবসংজ্ঞক হলে দুই, বৃক্ষের নাম হলে তিন, নদীর নাম হলে পাঁচ, ফুলের নাম হলে ছয়, তা ছাড়া অন্য কিছু হলে সাত যোগ করে দেখতে হবে সংখ্যা যুগ্ম না অযুগ্ম হচ্ছে।

যুগ্ম হলে মেয়েটি সতী, অযুগ্ম হলে অসতী হবে।

ধরা যাক, মেয়ের নাম জাহ্নবী। একটি নদীসংজ্ঞক নাম, তাই তিন অক্ষরের সঙ্গে পাঁচ যোগ করে হলো মোট আট, অর্থাৎ যুগ্ম সংখ্যা। তাই মেয়েটি সতী হবে।

মেয়ের নাম অপরাজিতা অর্থাৎ পুষ্পসংজ্ঞক। তাই পাঁচ অক্ষরের সঙ্গে ছয় যোগ করে হলো মোট এগারো—অর্থাৎ মেয়েটির অসতী হওয়ার আশংকা বেশী।

দেবনাম্নি বৃক্ষনাম্নি নদীকুসুমনামনি।
দ্বিত্রিপঞ্চষট্ সপ্তানি যোজয়েদন্যনামনি।
সতী বাপ্যসতী বালা যুগ্মেহযুগ্মে যথাক্রমম্ ॥

এ ছাড়া আর একটি পদ্ধতি আছে।

যে বিবাহ করবে এবং যাকে বিবাহ করবে অর্থাৎ বর ও কন্যা দুজনের নামে যে কয়টি অক্ষর হবে, তার সংখ্যা গ্রহণ করবে।

পরে দু'জনের বয়স কত সেই সংখ্যা আগের সংখ্যার সঙ্গে যোগ করতে হবে।

যোগ করে যে সমষ্টি হলো তাকে চার দিয়ে গুণ করে গুণফল থেকে তিন বিয়োগ করতে হবে। তারপর যা বাকি রইল তার সঙ্গে আবার দু'জনের নামের সংখ্যা যোগ করতে হবে। যোগ করে যে যোগফল হলো তাকে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে।

যদি ভাগফল এক থাকে, তাহলে সে সতী হবে, দুই বাকি থাকলে জানা যাবে মেয়েটি কুলটা বা তাকে গ্রহণ করলে মেয়েটিকে খুব ক্লেশ পেতে হবে। যদি সে পতিগৃহ ত্যাগ করে না যায়, তবু সে গোপনে পরপুরুষে নিরত হবে।

যদি শূন্য ফল হয় অর্থাৎ কিছু বাকি না থাকে তাহলে মেয়েটিকে নির্বিবাদে গ্রহণ করা যায়।

মনে করা যাক, বরের নাম সমরেশ আর মেয়েটির নাম অপরাজিতা। এখন বরের নামের সংখ্যা ৪ আর মেয়েটির নামের সংখ্যা হলো ৫, মোট যোগফল হলো ৯। বরের বয়স ২২ আর মেয়েটির বয়স ১৪ মোট হলো ৯ + ২২ + ১৪ = ৪৫ বর। একে ৪ দিয়ে গুণ করে গুণফল হলো ১৮০, তা থেকে তিন বাদ দিলে হলো ১৭৭। আবার বর ও কনের নামের সংখ্যা ৯ যোগ করে হলো ১৮৬, একে তিন দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকে না কিছু। অর্থাৎ এই মেয়েটি পতিব্রতা ও সতী হবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কামশাস্ত্র ও শৃঙ্গার

এবারে রতিশাস্ত্রের অন্য একটি বিষয় বর্ণনা করা হবে। একে বলা হয় কামবিজ্ঞান বা কামশাস্ত্র।

এই অংশে স্ত্রীর দৈহিক মিলনের কথা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে (মোট দশটি অধ্যায়) বর্ণনা করা হয়েছে। রতিশাস্ত্র এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো মাত্র।

কামশাস্ত্রমতে অর্থাৎ নরনারীর মিলনের বিষয়ে নরনারীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পুরুষের ধ্বজের আকৃতির বিভিন্নতা হিসাব করে এই বিভাগ করা হয়েছে।

পুরুষেরা শশ, বৃষ ও অশ্ব এই তিন ভাগে বিভক্ত। শশ পুরুষের ধ্বজ ছয় আঙ্গুল, বৃষের নয় ও অশ্বের বারো আঙ্গুল দীর্ঘ বলে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ঠিক তেমনি তিনপ্রকার যোনিযুক্ত নারীও বর্ণিত হয়েছে—মৃগী, ঘোটকী ও হস্তিনী। তাদের যোনির দৈর্ঘ্যও যথাক্রমে ছয়, নয় ও বারো আঙ্গুল হয়ে থাকে।

এর পরের শ্লোকে বলা হয়েছে—সদৃশ সমরত আর বিষম সমরতের কথা।

শশ পুরুষের সঙ্গে মৃগী নারীর রতি সমরতি অর্থাৎ দু'জনের ধ্বজ ও যোনি সমান।

তেমনি বৃষ ঘোটকী ও অশ্ব হস্তিনী সমরত।

বিষমতর অর্থাৎ ছোট বড় আকারের মধ্যে রতির আবার প্রকারভেদ আছে।

১। ব্যবহিত ঃ যদি পুরুষের লিঙ্গ আকারে বড় হয় এবং তদনুপাতে স্ত্রী-যোনি খুব ছোট হয় (যেমন বৃষের অনুপাতে মৃগীর) তাহলে দুই স্ত্রী পুরুষের মিলনকে ব্যবহিত (আঁটসাঁট) বলে।

২। উচ্চতর রত ঃ মৃগজাতির সঙ্গে অশ্বজাতির রতিক্রিয়া যোনি ও লিঙ্গ খুব ছোট বড় হয়ে পুরুষাঙ্গ সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট না করিয়ে রতি হয়। ওকে উচ্চতর রত বলে।

৩। নীচরত ঃ যদি পুরুষাঙ্গের তুলনায় স্ত্রীলোকের যোনি আকারে বেশি বড় হয়, তাহলে তাকে নীচরত বলে। যেমন হস্তিনীর সঙ্গে বৃষের। তাহলে লিঙ্গ সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট হলেও যোনির একেবারে তলদেশে পৌঁছাতে পারে না।

৪। নীচতর রত ঃ যদি পুরুষাঙ্গ খুব ছোট ও স্ত্রীযোনি খুব বড় হয় তাকে নীচতর রত বলে—যেমন শশ হস্তিনী। এতে কারোরই পুলক লাভ হয় না।

আকার বাদে সঙ্গমের স্থায়িত্ব কাল অনুযায়ী রতি মিলনকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। শীঘ্রকাল—যেমন পুরুষের সত্বর পুলকলাভ হয়।
২। মধ্যকাল—যাদের মাঝামাঝি সময় লাগে।
৩। চিরকাল—যাদের দীর্ঘসময় স্থায়ী হয়।

ঠিক তেমনি স্ত্রীলোকেরও মন্দবেগা, মধ্যবেগা ও চন্ডবেগা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

এখানেও তেমনি সমান পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমরতি ও বিভিন্নতা অনুযায়ী বিষমরতি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে শাস্ত্রে।

যেমন মধ্যকালের সঙ্গে মধ্যবেগা নারী বা চিরকাল পুরুষের সঙ্গে চন্ডবেগা নারী সমরতি—আর মধ্যকাল পুরুষ ও চন্ডবেগা নারী বিষমরতি।

শৃঙ্গার

এভাবে কামশাস্ত্রে রতিপ্রকৃতি বর্ণনা করে তারপর শৃঙ্গার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

শৃঙ্গারশাস্ত্রে বলা হয়েছে, রতিক্রিয়ার আগে নারী-পুরুষের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলন বা তার দ্বারা সুখ অনুভবকে শৃঙ্গার বলে।

কামশাস্ত্রমতে নারীর যৌন অনুভূতির যোনি ছাড়া আরও অন্য নানা কেন্দ্র আছে। এই সব কেন্দ্রে আনন্দ-অনুভূতি লাভ করা যেতে পারে—তাই শৃঙ্গার।

নখ কেশ দন্তাঃ স্তন চ নিতম্ব ভগঃ।
নয়ন ওষ্ঠ ত্বক শৃঙ্গারস্য নব কেন্দ্রঃ ॥

অর্থাৎ শাস্ত্রমতে নারীর কামকেন্দ্র নয়টি।

১। নখ। ২। কেশ। ৩। দন্ত। ৪। স্তন। ৫। নিতম্ব। ৬। ভগদেশ। ৭। নয়ন। ৮। ওষ্ঠ। ৯। ত্বক।

অবশ্য এর মধ্যে শৃঙ্গার অনুযায়ী কয়েকটি স্থানের প্রধান প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন- স্তন, ওষ্ঠ, ভগদেশ প্রভৃতি।

শৃঙ্গারের মধ্যেও তেমনি স্পর্শন, মর্দন, চুম্বন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে।

শাস্ত্র অনুযায়ী রতিক্রিয়াকে চৌষট্টিটি কলায় বিভক্ত করা হয়েছে। এর কারণ চৌষট্টিটি প্রক্রিয়া এর অন্তর্ভুক্ত।

রতিপ্রক্রিয়া মোট আটটি ভাগে বিভক্ত—

চুম্বন নখচ্ছেদ্য দর্শনচ্ছেদ্য সম্বেশন সীৎকৃত পুরুষায়িতৌপরি ষ্টিকানামাষ্টৌনা।

যথা—১। আলিঙ্গন—নরনারীর পরস্পর মিলনের পূর্বে আলিঙ্গন প্রাথমিক কার্য। আলিঙ্গনের প্রকারভেদ আছে।

২। চুম্বন। চুম্বনের আবার প্রকারভেদ আছে।

৩। নখচ্ছেদ্য। রতিক্রিয়ার সময় পরস্পরের অঙ্গে নখ দিয়ে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেওয়া।

৪। দশনচ্ছেদ। পরস্পরকে দাঁত দিয়ে কামড়ানো।

৫। সম্বেশন। বিভিন্ন আসনে বা ভঙ্গিতে রতিক্রিয়া।

৬। সীৎকৃত। মুখ দ্বারা অস্ফুট শব্দ করা।

৭। পুরুষায়িত (বিপরীত বিহার)। পুরুষের বুকের ওপর উঠে স্ত্রীর রতিক্রিয়া করা।

৮। ঔপরিষ্টক। নায়িকা বা স্ত্রীর মুখগহ্বরে রতিক্রিয়া করারক ঔপরিষ্টক বলে।

এই আটটি প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির আবার আটটি করে বিকল্প বা প্রকারভেদ আছে—মোট চৌষট্টিটি কলা।

আলিঙ্গন

আলিঙ্গন নারীদেহের সর্বত্র সমান আরামপ্রদ হয় না। কামকেন্দ্র অর্থাৎ স্তন, ওষ্ঠ, গাল, নিতম্ব প্রভৃতি অধিকতর অনুভূতিশীল ও কোমল বলে সুখাবহ। আলিঙ্গনকালে এই সব অঙ্গ বিশেষ পদ্ধতিতে স্পর্শ করলে সুখ বা আনন্দ বেশি হয়।

কামশাস্ত্রমতে আলিঙ্গনের যে প্রকারভেদ তা বিশ্বের সমস্ত বিখ্যাত যৌন বিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত।

আলিঙ্গনকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক অর্থাৎ অনভিজ্ঞা নায়িকার প্রতি প্রযোজ্য আলিঙ্গন ও অভিজ্ঞা নায়িকার সঙ্গে রতিবিহারকালে আলিঙ্গন।

অনভিজ্ঞা নায়িকার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা যায় নিম্নোক্ত চার প্রকার আলিঙ্গন দ্বারা—

১। স্পৃষ্টক বা মৃদু স্পর্শ।
২। বিদ্ধক বা স্তনাগ্র দ্বারা বিদ্ধ করে আলিঙ্গন।
৩। উদ্‌ঘৃষ্টক বা ঘর্ষণ পূর্বক আলিঙ্গন।
৪। পীড়িতক বা সজোরে ঘর্ষণ পূর্বক আলিঙ্গন।

স্পৃষ্টক—প্রেমিকা সামনে আছে কিন্তু অপরের উপস্থিতির জন্য বা অন্য কারণে নায়ক তাকে আলিঙ্গন করতে পারছে না। এই অবস্থায় নায়িকাকে নিজের অনুরাগ জানাবার জন্যে নায়ক অন্য কোন কাজের ছুতোয় তার পাশ দিয়ে যাবে এবং এমনভাবে তার গায়ে গা ঠেকাবে যেন এটা তার ইচ্ছাকৃত তা অন্য কেউ বুঝতে না পারে।

বিদ্ধক—এই আলিঙ্গনে নায়িকাই অগ্রণী হয়ে সক্রিয় হয়। নায়িকা যখন দেখে যে নায়ক একা কোন নিরালা জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে আছে, তা হলে কোন জিনিস নেবার ছুতোয় তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে—তারপর সামনে বা হতে স্তনাগ্র দিয়ে নায়কের দেহে চাপ দেবে। নায়ক সঙ্গে সঙ্গে দুটি বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবে—একে বলে বিদ্ধক আলিঙ্গন।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে পরিচয় আছে কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়নি, এই আলিঙ্গন তাদের প্রতি প্রযোজ্য।

উদ্‌ঘৃষ্টক—অন্ধকারে যেখানে বহু লোক সমাগম হয় তেমন স্থানে অথবা বিজন স্থানে অন্যের অলক্ষিতে বহুক্ষণ ধরে নায়িকা ও নায়ক ধীরে ধীরে পরস্পরের গা ঘর্ষণ করবে। একে বলে উদ্‌ঘৃষ্টক। কিন্তু যদি শুধু একজন ঘর্ষণ করে, তাকে বলে ঘৃষ্টক।

পীড়িতক—এটি ঘৃষ্টকেরই প্রকারভেদ। এতে গাত্রঘর্ষণরত প্রণয়ী দু'জনের মধ্যে একজন প্রাচীরে বা স্তম্ভের গায়ে অপরকে চেপে ধরে ঘর্ষণ করবে বা জড়িয়ে ধরবে।

রতিক্রিয়াকালে আলিঙ্গন

এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলা হলো, তাতে যতদিন নায়িকা ও নায়ক পরস্পর দৈহিক ঘর্ষণেই তৃপ্ত থাকে ততদিনের কথা।

কিন্তু দুজনে যখন রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, তখন অবশ্য আলিঙ্গন ভিন্ন প্রকার। এর বিভিন্নতা অনুযায়ী বর্ণনা দেওয়া হলো।

১। **লতাবেষ্টিতক**—লতা যেমন গাছকে জড়িয়ে থাকে, তেমনিভাবে প্রেমিকা তার প্রণয়ীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে চুম্বন করার জন্যে নিজের মুখ ওঠাবে এবং প্রেমিকের মুখখানি নামিয়ে আনবে। অথবা নায়ককে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করেই শরীর একটু উঁচু করে মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ করবে বা পাশের কোন রমণীয় বস্তুর দিকে চেয়ে থাকবে।

২। **বৃক্ষাধিরূঢ়ক**—এটি একটি নিবিড় আলিঙ্গন। নায়ক দাঁড়িয়ে থাকবে আর প্রেমিকা নিজের এক পা তার পায়ের ওপর রাখবে এবং অন্য পা দিয়ে তার উরুদেশ বেষ্টন করে ধরবে। এত যোনি ও লিঙ্গের ঘর্ষণজনিত সুখ অনুভূত হবে।

কিংবা নায়ক দাঁড়ালে নায়িকা গাছে ওঠার ভঙ্গিতে তার দেহ বেয়ে দু'টি পা দিয়ে তাকে বেষ্টন করে দুহাত দিয়ে তার কণ্ঠসংলগ্ন হবে।

দণ্ডায়মান অবস্থায় এই দু'টি আলিঙ্গন। আবার শায়িত অবস্থায় অন্য দু'টি—

৩। **তিলতণ্ডুলক** (চালের সঙ্গে তিলের মিশ্রণ)—নায়ক নায়িকা নিজ নিজ পার্শ্বদেশের উপর ভর দিয়ে মুখোমুখি শয়ন করবে। যে বাঁ দিকে শয়ন করবে সে অন্যের দক্ষিণ কক্ষের নিচে নিজের বাঁ হাত রাখবে আর যে দক্ষিণ দিকে শয়ন করবে সে এর বিপরীত করবে।

তারপর একে অপরের দক্ষিণ উরুর ওপর বাম উরু ও বাম উরুর ওপর দক্ষিণ উরু স্থাপন করে যাতে যৌনাঙ্গের ঘর্ষণ নিবিড় হয় সেই উদ্দেশ্যে পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করবে।

৪। **ক্ষীরনীরক** (দুধ ও জলের মিশ্রণ)—কোলের উপর মুখোমুখি শায়িতা নায়িকার দেহকে নায়ক বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করবে। তারপর কামাবেগে নায়ক-নায়িকা এমন জোরে আলিঙ্গন করবে যেন একে অপরের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চায়।

এ ছাড়া শাস্ত্রমতে বিভিন্ন অঙ্গ অনুযায়ী আলিঙ্গনের আরো প্রকারভেদ আছে।

১। উরূপগূহন (সাঁড়াশি)।

২। জঘনোপগূহন (উরু জঙ্ঘা)।

৩। স্তনালিঙ্গন।

৪। ললাটিকা বা কপালে কপালে ঠোকাঠুকি।

একে একে সেগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে।

উরুপগূহণ (উরু সাঁড়াশি) আলিঙ্গন—স্ত্রী পুরুষ পাশাপাশি শোবে এবং তাদের মধ্যে একজন অপরের একটি উরুকে বা উরুদ্বয়কে নিজের উরু দুটি দিয়ে সাঁড়াশির মত দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করে ধরবে। যার উরুদুটি বেশী মাংসল সেই সকর্মক হবে, কারণ উরুর পীড়ন বড় আরামদায়ক।

জঘনোপগূহণ—পুরুষ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে আর নারী তার বুকের ওপর উঠে কেশপাশ এলিয়ে দিয়ে নিজের জঘন (তলপেটের নিম্নে দুই উরু মধ্যবর্তী স্থান) নিয়ে পুরুষের কটিদেশে চাপ দেবে। এই অবস্থায় নায়িকা নখ এবং দাঁত দিয়ে নায়কের দেহে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেবে ও চুম্বনাদি প্রয়োগ করবে। এটি বিপরীত বিহারের প্রাথমিক পর্ব।

স্তনালিঙ্গন—নায়ক নায়িকা মুখোমুখি বসবে কিংবা পাশাপাশি শোবে, অথবা নায়ক চিৎ হয়ে শোবে আর নায়িকা তার বুকের ওপর আরোহণ করবে। এই তিনটির যে কোন অবস্থায় নায়িকা নিজের দেহের সমস্ত ভার নায়কের ওপর অর্পণ করে বুকে এমন চাঁপ দিবে যে, নায়কের মনে হবে, নায়িকা তার বুকে পূর্ণ চাপ দিচ্ছে। স্তন দ্বারা চাপ বেশি দিতে হয় বলে এর নাম স্তনালিঙ্গন।

ললাটিকা—(কপালে কপালে ঠুকাঠুকি)—দুইজনের মুখোমুখি আলিঙ্গন করে ললাটে ঠুকাঠুকি হলে তার নাম ললাটিকা।

সংবাহন বা অঙ্গমর্দন

গা টেপা এবং গায়ে হাত বুলোনোকে সংবাহন বলে।

আমাদের মতে সংবাহন আর আলিঙ্গন এক। কিন্তু বাৎস্যায়নের মতে সংবাহন ও আলিঙ্গন ভিন্ন। অনেক সময় নায়ক বা নায়িকা সংবাহন পছন্দ করে না।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে টিকাকার বলেছেন, সংবাহন আর আলিঙ্গন দুয়েই স্পর্শসুখ হয় বটে, কিন্তু এ দুয়ের সুখ একই কালে অনুভব করা যায় না।

আলিঙ্গনের প্রয়োগ করতে হয় রতিবিহারের ঠিক পূর্বে, কিন্তু সংবাহন অন্য সময় বা রতিবিহারের পরে।

তাছাড়া আলিঙ্গনের মাধ্যমে দুজনের সুখ অনুভব হয়, কিন্তু সংবাহনে হয় একজনের।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

চুম্বন

দেহের বিভিন্ন স্থানে চুম্বনের রীতি শাস্ত্রে প্রচলিত আছে। সে সম্বন্ধে শ্লোক হচ্ছে ঃ

ললাটালককপোলনয়নবক্ষঃ স্তনোষ্টান্তর্মুখেষু চুম্বনম্।
উরুসন্ধি বাহুর্নাভিমূলয়োর্ললাটানাম্।
রাগবশাদ্দেশ প্রবৃদ্ধেশ্চসন্তি তানি তানি স্থানানি।
ন তু সর্ব্বজন প্রয়োজ্যনীতি বাৎস্যায়নঃ ॥

ললাট, অলক (চুল), কপোল (গাল), নয়ন ত্বক, স্তন ওষ্ঠ (ঠোঁট) এবং ষ্ঠান্তর্মুখ (মুখগহ্বর) এই কয়টি শাস্ত্রমতে চুম্বনের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

লাট দেশের (দক্ষিণ গুজরাট) লোকদের মধ্যে উরুসন্ধি, বাহুমূল ও নাভিমূলে চুম্বনের রীতি আছে। যদিও সব দেশে তা প্রযোজ্য নয়—তবু অনুরাগের সময় চুম্বন ঠিক কোন নির্দিষ্ট আইন মেনে চলে না।

অনেক শিষ্ট লোকএগুলি ঘৃণার চোখে দেখে, আবার অনেকে কাম উত্তেজনার সময় শিষ্টতা মানে না।

ঠোঁট দুটিকে মুকুলের মত সূক্ষ্মাগ্র করে অন্যের দেহের বিশেষ বিশেষ স্থান স্পর্শ করাকেই বলে চুম্বন। এই স্পর্শের স্থান ও পদ্ধতি ভেদে চুম্বনের প্রকারভেদ করা হয়। চুম্বনের এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে আবার মুখচুম্বনই মুখ্য স্থান অধিকার করে।

যে কন্যার রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা হয়নি এবং স্বামীর প্রতি বা প্রেমিকের প্রতি যার বিশ্বাস জন্মেনি, তার জন্য তিন প্রকার অধর চুম্বন বিধি নির্দিষ্ট হয়েছে।

১। নিমিতক (পরিমিত) চুম্বন।
২। স্ফুরিতক (কম্পমান) চুম্বন।
৩। ঘটিতক চুম্বন।

নিমিতক চুম্বন—পূর্বরাগের প্রথম পর্বে প্রেমিকা যখন প্রেমিককে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না, তখন সে এই চুম্বন করতে পারে।

নায়িকার চুম্বন লাভের আশায় নায়ক যখন পীড়াপীড়ি করবে, হয়ত বা একটু বলপ্রয়োগও করবে, নায়িকা তখন তার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে নায়কের মুখে মুখ রাখে কিন্তু চুম্বন করে না। তাকেই নিমিতক চুম্বন বলে।

স্ফুরিতক চুম্বন—প্রেমিক তার প্রণয়িনীর মুখের ভিতর নিজের অধর প্রবেশ করিয়ে দেয়। সেই পরশ ব্রীড়াবনতা প্রেমিকার দেহে পুলকস্পন্দন জাগিয়ে তোলে,

তার লজ্জা ঈষৎ কেটে যায় এবং ইচ্ছা হয় যে, প্রেমিকের অধরকে নিজের মুখের ভেতরে চেপে রাখে।

কিন্তু প্রথম দৈহিক মিলনের সংকোচ সে সম্পূর্ণ কাটাতে পারে না, এই কামনা ও লজ্জার দোটানায় পড়ে তার মন বিচিত্রভাবে আন্দোলিত হতে থাকে—সহসা সে নিজের ঠোঁট ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে এবং প্রেমিকের অধরকে নিজের ঠোঁটের মধ্যে রাখতে অনিচ্ছা দেখায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, নায়ক নিজের ঠোঁট বের করবার চেষ্টা করলে নিজের অধরোষ্ঠ দিয়ে সজোরে চেপে ধরে। এই চুম্বনে নায়িকার অধর মৃদু মৃদু কম্পিত হয় বলে এর নাম স্ফুরিতক চুম্বন।

ঘটিতক চুম্বন—এবার নায়িকার সাহস বেড়েছে, সে আরো একটু অগ্রসর হয়েছে। এখন প্রথমে সে নিজের হাত দিয়ে নায়কের চোখ দুটি ঢেকে ফেলে, তারপর লজ্জায় নিজেও চোখ বুজে নায়কের অধরপ্রান্তে নিজের ঠোঁট দুটি দিয়ে চেপে ধরে এবং জিহ্বা দিয়ে মুখের ভিতর আবদ্ধ প্রেমিকের অধরের চারিদিক ঘুরিয়ে স্পর্শ করে। একে বলে ঘটিতক চুম্বন।

এবারে প্রকৃত চুম্বনের বিষয়ে বলা হচ্ছে।

পূর্বরাগের পর সাধারণ চুম্বনকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—

(১) সমচুম্বন।
(২) বক্র চুম্বন।
(৩ উদ্‌ভ্রান্ত চুম্বন।
(৪) অবপীড়িতক চুম্বন।

সমচুম্বন—প্রেমিক প্রেমিকা মুখোমুখি বসে। প্রেমিক নিজের ঠোঁট দুটি দিয়ে সোজা প্রেমিকার দুটি ঠোঁট চেপে ধরে চুম্বন করে। সোজা বলে এর নাম সমচুম্বন।

বক্রচুম্বন—একে অপরের মুখ ঘুরিয়ে নিজের মুখের কাছে আনে এবং আপন অধরোষ্ঠ গোলাকার করে অপরের অধর চেপে ধরে।

উদ্‌ভ্রান্ত চুম্বন—একে অপরের মাথায় এবং চিবুকে ধরে তার মুখ ঘুরিয়ে নিজের মুখের কাছে এনে তার ঠোঁটে চুম্বনরেখা এঁকে দেয়। তাকে বলে উদ্‌ভ্রান্ত চুম্বন।

অবপীড়িতক চুম্বন—উপরি-উক্ত ভঙ্গিতে যদি একে নিজের অধরোষ্ঠ দ্বারা অপরের ঠোঁট দুটির ওপর খুব জোরে চাপ দিয়ে চুম্বন করে, তাহলে একে বলে অবপীড়িতক চুম্বন।

এই অবস্থায় যদি উভয়েই উভয়ের অধরোষ্ঠের ওপর চাপ দেয় তাহলে তাকে বলে শুদ্ধ অবপীড়িতক চুম্বন। ঠোঁটের সঙ্গে জিহ্বা যোগ করলে তাকে বলে অধর পান।

এছাড়া আরও কয়েক শ্রেণীর চুম্বনের কথা বলা হয়েছে শাস্ত্রে।

যেমন—

(১) আকৃষ্ট চুম্বন—নায়ক যদি নিজের বুড়ো আঙ্গুলের ও তর্জনীর সাহায্যে নায়িকার নীচের ঠোঁটকে গোলাকার করে নিজের মুখের কাছে এনে অধরোষ্ঠ দ্বারা চাপ দেয়, তাকে বলে আকৃষ্ট চুম্বন।

(২) উত্তর চুম্বিত—এই চুম্বনে নায়ক নায়িকা একই সঙ্গে সক্রিয় হয়। কামক্রীড়াকালে নায়িকা যদি হঠাৎ নায়কের অধর নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে চুম্বন, চোষণ ও লেহনাদি করতে থাকে তাহলে নায়ক সঙ্গে সঙ্গেই তার ওপরের ঠোঁট নিজের মুখের ভেতর পুরে অনুরূপ প্রক্রিয়া করতে থাকবে। তাকেই বলা হয় উত্তর চুম্বিত অর্থাৎ চুম্বনের উত্তর দেওয়া চুম্বন।

(৩) রাগোদ্দীপন—নিদ্রিত নায়েকের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নায়িকা হঠাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যদি তাকে চুম্বন করে এবং সেই চুম্বনের দ্বারা নায়কের রাগ বা অনুরাগ (প্রেম) বৃদ্ধি পায়, তাহলে একেই বলে রাগোদ্দীপন।

(৪) চুম্বন দ্যুতক্রীড়া (প্রতিযোগিতা)—নায়ক নায়িকা কোন একটি জিনিস পণ রেখে চুম্বন প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। তারা পরস্পরের সম্মতিক্রমে একে অপরকে আলগাভাবে চুম্বন করতে শুরু করবে। এমনিভাবে পরস্পর চুম্বন করতে করতে যে প্রথম অপরের অধরকে নিজের দুটি ঠোঁটের ভেতর গ্রহণ করতে সমর্থ হবে—সেই জয়ী হবে এবং পণ রাখা জিনিসটি গ্রহণ করতে পারবে।

এই চুম্বন-প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে নায়িকা কাঁদ-কাঁদ হয়ে ভাণ করবে যেন তার ঠোঁটে অসহ্য ব্যথা পেয়েছে। তখন সে নিজের ঠোঁট চেপে ধরবে, কৃত্রিম কোপ সহকারে তর্জন করতে থাকবে যেন সে ব্যথা পেয়েছে—নায়ককে সে দূরে ঠেলে দিতে চাইবে।

কিন্তু এই প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও নায়ক যদি তাকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করতে যায়, তখন সে দাঁত দিয়ে হঠাৎ তার ঠোঁট কামড়ে ধরবে; তারপর হাস্য-পরিহাস সহকারে বলবে—এবারে আমি জিতেছি। এইভাবে প্রেম বৃদ্ধি পায়।

আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী আরও কয়েকটা চুম্বনের কথা শাস্ত্রে লিখিত হয়েছে। তা হলো—

১। চলিতক চুম্বন।

২। প্রতিবোধিক চুম্বন।

৩। মনোভাব প্রকাশক চুম্বন।

৪। সংক্রান্তক চুম্বন।

৫। আভিযোগিক চুম্বন।

চলিতক—নায়ক গীত, চিত্র, সাহিত্য ইত্যাদি কলাচর্চা বা অন্য দুরূহ কার্যে নিবিষ্টচিদ্য থাকলে তার মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবার জন্যে নায়িকা চুম্বন করবে। কিংবা দু'জনে কলহ হলে একজন ইচ্ছা করে অন্যমনস্কর ভাণ করবে, অন্যজন চুম্বন করে তাকে আকৃষ্ট করবে।

প্রতিবোধিক—নায়ক অসময়ে বা অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরে নায়িকার ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে বা নিজের প্রতি তার কৃত্রিম ক্রোধ দূর করবার জন্যে চুম্বন করলে তাকে প্রতিবোধিক বলে।

মনোভাব প্রকাশক—আর্শীতে বা প্রাচীরে নায়কের ছায়া চুম্বন বা কোনও ছোট খেলনাকে চুম্বন করে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা।

সংক্রান্তক—নায়ক বা নায়িকা একে অন্যকে দেখিয়ে যদি কোনও শিশু বা বালককে ঘন ঘন চুম্বন করে এবং এমন ভাব দেখায় যে নায়ক বা নায়িকাকে চুম্বন করতে চায় তবে তাকে বলে সংক্রান্তক চুম্বন।

এতে সকলের সামনে মনোভাব প্রকাশ বা বাক্যালাপ না হলেও মনের ভাব বেশ স্পষ্ট জানান যায়।

অভিযোগিক চুম্বন—নায়ক বা নায়িকা ধীরে ধীরে একে অপরের গা টিপতে টিপতে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এমনিভাবে একে অপরের গায়ে শুয়ে পড়বে। তারপর এক ফাঁকে ধীরে ওষ্ঠ দুটি দ্বারা অপরকে চুম্বন করবে। উরুদ্বয় বা হাতের উপরাংশে এভাবে চুম্বন করা হয়। এ যেন একে অপরকে প্রশ্ন করছে, আমি ত অনুরাগী, তুমি কি আমায় ভালবাস?

অন্যজন তখন এর উত্তর দেবে চুম্বন দ্বারা।

নখবিলেখন (নখ দিয়ে আঁচড়ানো)

আলিঙ্গন ও চুম্বনের মত নখবিলেখন বা নখ দিয়ে আঁচড় দেওয়াও শৃঙ্গারের একটি অঙ্গ।

কোন্ কোন্ সময়ে নখবিলেখন প্রযোজ্য এ সম্বন্ধে সুন্দর শ্লোক আছে—

তস্য প্রথম সমাগমে, প্রবাস প্রত্যাগমনে প্রবাস গমনে,
ক্রুদ্ধাৎ প্রসন্নায়াং মত্তায়াং চ প্রয়োগঃ ॥

১। প্রথম রতিক্রিয়াকালে।
২। দীর্ঘ প্রবাসের পর নায়ক বা নায়িকার মিলন হলে।
৩। প্রবাস যাত্রাকালে দুজনের শেষ মিলন সময়ে।
৪। কুপিতা প্রণয়িনী বা স্ত্রীর প্রসন্নতা বিধানের জন্য।
৫। নায়িকা সুরাপানাদি দ্বারা প্রমত্ত হলে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নখচ্ছেদ্য নিষিদ্ধ সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—'ন নিত্যমচণ্ডবেগয়ো'। যে সব নায়িকা চণ্ডবেগা নয় অর্থাৎ যাদের কামবেগ মৃদু অথবা

মধ্যম, তাদের ওপর নিত্য নখচ্ছেদ্য প্রয়োগ করা চলবে না। তবে মাঝে মাঝে তা প্রয়োগ অবশ্য চলতে পারে।

কামক্রীড়ায় রাগ বৃদ্ধিকালে নখচ্ছেদের মত দশনচ্ছেদও প্রযোজ্য, বলা হয়েছে শাস্ত্রে।

নখচ্ছেদ্য প্রয়োগের স্থান—

কক্ষৌ স্তনৌ গলঃ পৃষ্ঠং জঘনমূরূং চ স্থানানি।

কক্ষদ্বয়, স্তনদ্বয়, গলদেশ, পৃষ্ঠদেশ, জঘন বা জানু এবং দুটি উরু এই হচ্ছে নখচ্ছেদ্যের স্থান।

এবারে নখচ্ছেদ্যের বিভিন্ন প্রকারভেদের কথা বলা হচ্ছে। নখচ্ছেদ্য আট প্রকার—

তদাচ্ছুরিতকম্ অর্দ্ধচন্দ্রমন্ডলং রেখা ব্যাঘ্রনখং ময়ূরপদকম্।
শশপ্লুতকম্ উৎপলপত্রমিতি রূপতোহষ্ট বিকল্পম্ ॥

১। আচ্ছুরিতক ২। অর্ধচন্দ্র ৩। মন্ডল ৪। রেখা ৫। ব্যাঘ্রনখ ৬। ময়ূরপদক ৭। শশপ্লুতক ৮। উৎপলপত্রক।

এই কয় শ্রেণী নখচ্ছেদ্য হলো রূপবৎ অর্থাৎ প্রিয়জনে দেহের নক্সা বা চিত্র এঁকে দেওয়া।

এছাড়া আছে অরূপবৎ অর্থাৎ যেমন তেমন নখের আঁচড়। তা আবার তিন ভাগে বিভক্ত। ১। মৃদু ২। মদ্য ৩। অতিমাত্র অর্থাৎ ধীরে, মাঝামাঝি এবং খুব জোরে নখ দিয়ে আঁচড়ানো।

আচ্ছুরিতক—নায়ক তার মাঝারি আকারের পাঁচটি নখ পরস্পর বিভিন্নভাবে নায়িকার স্তনের ওপর, চোয়াল বা অধরপ্রান্তে রাখবে এবং এমন হালকাভাবে খুব আস্তে আস্তে সেগুলিকে টেনে এনে পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করবে, যেন কোন প্রকার আঁচড়ের দাগ না পড়ে। এতে ঐ সব স্থানে সুড়সুড়ি দেওয়ার মত স্পর্শসুখ অনুভূত হবে—তারপর বেগ বাড়িয়ে জোরে চামড়াকে স্পর্শ করবে যাতে নখরগুলির সঙ্গে সংস্পর্শে মৃদু খস্-খস্ শব্দ হয়। এর নামই আচ্ছুরিতক।

অর্ধচন্দ্র—ঘাড়ে এবং স্তনের পিঠে বাঁকাভাবে নখ বসিয়ে দিয়ে চামড়ার ওপর একটি অর্ধবৃত্তাকার ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিলে তাকে বলে অর্ধচন্দ্র।

মন্ডল—পরস্পরের বিপরীত দিকে দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি নখক্ষতচিহ্ন এঁকে দিলে তাকে বলে মন্ডল।

নাভিমূলে, যোনির উপরিভাগে নিতম্বের উপর, উরুদেশে মন্ডলচিহ্ন অংকন করা যেতে পারে।

রেখা—এই বিলেখন দেহের সব স্থানেই প্রযোজ্য, অনতিদীর্ঘ রেখা টানা হয় এতে।

ব্যাঘ্রনখ—স্তনমুখ থেকে যে সব উর্ধমুখী বক্র নখক্ষত-রেখা এঁকে দেওয়া হয় তাকেই বলে ব্যাঘ্রনখ।

ময়ূরপদক—পাঁচটি নখকে স্তনের বোঁটার অভিমুখে আকর্ষণ করে যে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেওয়া হয় তাকেই বলে ময়ূরপদক।

এই চিহ্ন কিভাবে আঁকতে হয় তা একটু বুঝিয়ে বলা হচ্ছে।

স্তনমুখের (স্তনের আগার কালো স্থান) নিচে বুড়ো আঙ্গুলটিকে রাখবে এবং অন্য আঙুলগুলিকে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট করে স্তনপুটে স্থাপন করবে। তারপর এই ঘনবিন্যস্ত আঙুলগুলি বোঁটার দিকে টেনে আনবে। এতে ময়ূরের পায়ের মত ক্ষতচিহ্ন হয় বলে একে বলে ময়ূরপদক।

শশপ্লুতক—যে নায়িকা নায়কের সঙ্গে মিলিত হওয়াকে গর্বের বিষয় মনে করে, নায়ক নিজের পাঁচটি নখ সম্মিলিতভাবে তার স্তনের বোঁটার চারপাশে স্থাপন করবে এবং সজোরে দুই স্তনের মাংসের ভিতরে পাঁচটি নখ বসিয়ে দিবে। এর দ্বারা যে রেখাপাত হবে তাকে বলে শশপ্লুতক।

এখানে টিকাকার বলেছেন—সব স্ত্রীলোক নিজের স্তনে নায়কের নখ প্রবিষ্ট হলে বিশেষ গর্ব অনুভব করে।

উৎপলপত্রক (পদ্মপত্র)—স্তনের পিঠে, কোমরে, বুকে পদ্মপত্রের মত আকারের নখচিহ্ন এঁকে দেওয়াকে উৎপলপত্রক বলে। স্তনে একটি, কোমরে মালার মত উৎপলপত্রক নখচ্ছেদ এঁকে দেয়।

এই আট প্রকার ছাড়াও আছে স্মরণীয় নখচ্ছেদ—অর্থাৎ গুপ্ত প্রেমিক প্রচ্ছন্নভাবে এবং প্রেমিকা স্বেচ্ছায় নখচিহ্ন এঁকে দেয় যার দ্বারা তাকে মনে রাখা যায়, এর অর্থ মনে রাখার চিহ্ন।

উপরের প্রকারভেদ ছাড়াও পাখী, ফুল, কলসী, লতা ইত্যাদি নানা চিহ্ন নখচ্ছেদে এঁকে দেওয়া যেতে পারে।

ধনুর্বিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদির যেমন শেষ নাই তেমনি রতিবৈচিত্র, নখচ্ছেদ ইত্যাদির কোনও শেষ নেই। এসব বিচিত্র কামকেলির দ্বারা পরস্পরের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। ভালবাসা গভীর ও দৃঢ় হয়। যে নায়ক কামশাস্ত্র বর্ণিত শৃঙ্গারগুলি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়, নায়িকারা তাকেই অন্য সকলের চেয়ে বেশী কামনা করে।

অনেক সময় নায়ক বা নায়িকা পূর্ব প্রেম ভুলে গেলেও এই নখ বিলেখন দেখলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে পূর্ব প্রেম ফিরে আসে।

স্তনে নখক্ষত যুক্ত কোনও নারীকে দেখলে পুরুষের মনে প্রবল বাসনা জাগে, তার প্রতি প্রচণ্ড প্রেম জন্মায়। তেমনি যে পুরুষের দেহে নায়িকা-কর্তৃক ক্ষতচিহ্ন আঁকা থাকে, তাকে দেখলে নারীদের মনে প্রবল কামবাসনা জেগে ওঠে।

দশনচ্ছেদ্য

(রতিক্রিয়াকালে কামড়ানো)

জিহ্বা, চক্ষু, উপরের ঠোঁট এবং মুখগহ্বর বাদ দিয়ে যে যে স্থানে চুম্বন করা হয় সেই সব স্থানেই দশনচ্ছেদ্য প্রয়োগ করা যায় অর্থাৎ দাঁত দিয়ে কামড়ানো যায়।

ললাটাধরোষ্ঠ গলকপোলবক্ষস্তনাঃ
তথা লাটানামূরুসন্ধি বাহুমূল
নাভিমূলানি সন্তি তানি স্থানানি
ন তু সর্ব্বজন প্রযোজ্যা নীতি ॥

অর্থাৎ, কোথায় কোথায় দশনচ্ছেদ্য প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—ললাট, অধরোষ্ঠ, গলা, গাল, বক্ষ এবং স্তনযুগ এই কটি দশনচ্ছেদ্য প্রয়োগের স্থান। লাটগণ উরুসন্ধি, বাহুমূল এবং নাভিমূলেও দশন বিলেখন প্রয়োগ করে থাকেন কিন্তু তা সর্বজন প্রযোজ্য নীতি নয়।

এবারে দশনচ্ছেদের প্রকারভেদ করা হয়েছে।

গূঢ়কমুচ্ছূনকং বিন্দু বিন্দুমালা
প্রবালমণিঃ মণিমালা
খণ্ডাভ্রকং বরাহচর্ব্বিতকম্ ইতি
দশনচ্ছেদন বিকল্পাঃ ॥

অর্থাৎ, দশনচ্ছেদ্যের প্রকারভেদ মোট আট প্রকার—

১। গূঢ়ক ২। উচ্ছূনক ৩। বিন্দু ৪। বিন্দুমালা ৫। প্রবালমণি ৬। মণিমালা ৭। খণ্ডাভ্রক ৮। বরাহচর্ব্বিতক।

গূঢ়ক—একটিমাত্র দাঁত দিয়ে চামড়ার উপরে ঈষৎ চাপ দিলে চামড়ার উপরে যে ঈষৎ লাল দাগ পড়ে তাকে বলে গূঢ়ক।

উচ্ছূনক—কাম উত্তেজনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি দাঁত দিয়ে একটু জোরে চাপ দিলে যে দাগ পড়ে তাকে বলে উচ্ছূনক।

বিন্দু—ঠোঁটে একটি দাঁত দিয়ে চাপ দিয়ে যে একটি বিন্দুর মত চিহ্ন হয় তাকে বলে বিন্দু।

বিন্দুমালা—পর পর কয়েকটি বিন্দু দেহের অন্যস্থানে—গলা, বাহু, নিতম্ব প্রভৃতি স্থানে পড়লে তাকে বলে বিন্দুমালা।

প্রবালমনি—শরীরের কোন অঙ্গের খানিকটা দাঁত ও ঠোঁটের ভেতর পুরে চাপ দিলে সেই জায়গাটা প্রবালমণির মত লাল হয়ে ওঠে—অবশ্য এতে ক্ষতচিহ্ন হয় না।

মণিমালা—উপরের ঠোঁট এবং নিচের পাটির সামনের কয়েকটি দাঁত দিয়ে কোন অংগে চাপ দিলে ঠিক মালার আকারে যে দশনক্ষত হয় তাকে বলে মণিমালা।

খন্ডাভ্রক—দুটি পাটির সবগুলি দাঁত দিয়ে স্ত্রীর বা প্রণয়িণীর স্তনের পিঠে খানিকটা মাংস বৃত্ত আকারে গ্রহণ করে কামড়াবে। সব দাঁতের আকার এক রকম নয়; কোনটা মোটা, কোনটা মাঝারি, কোনটা সূক্ষ্ম—এইজন্য এই দন্তাঘাতে ছোট বড় ছাপ পড়ে।

বরাহচর্বিতক—স্তনপৃষ্ঠের একভাগ থেকে অল্প চামড়া দুই পাটি দাঁতের মধ্যে নিয়ে কিছুক্ষণ চিবাতে হবে। তারপর সে অংশটুকু ছেড়ে দিয়ে আর একভাগ চর্বণ করবে।

এমনিভাবে স্তনমাংস উপর্যুপরি চিবাতে থাকলে দীর্ঘ অভগ্ন চারটি বা ছ'টি রেখা পড়বে।

দন্তাঘাতে উৎপন্ন এই রেখাগুলির মধ্যবর্তী জায়গাটা হয়ে উঠবে লাল রঙের।

বরাহের মত চিবানো হয় বলে একে বলে বরাহচর্বিতক।

স্ত্রীলোকের স্তন বা কোনও মাংসল স্থান ধীরে ধীরে এভাবে চর্বণ করলে দুজনেরই আনন্দ ও সুখ অনুভূত হবে।

বিন্দুমাত্র, খন্ডাভ্রক, বরাহচর্বিতক কেবল প্রয়োগ করবে যে নারীর কামবেগ প্রচন্ড তাদের বেলায়।

অন্যগুলি সাধারণ নারীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দেশভেদে শৃঙ্গার ও কামক্রীড়ার বিভিন্ন রূপ

শাস্ত্রে লেখা হয়েছে, কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে রতিক্রিয়ার সময় তার নিজ দেশে যে ধরনের শৃঙ্গার-বিধি প্রচলিত তাই প্রয়োগ করবে। স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের প্রতি অনুরূপভাবে স্থানীয় রীতি অনুযায়ী উপচার প্রয়োগ করে।

মধ্যদেশের (গঙ্গা যমুনার মাঝের অঞ্চল) স্ত্রীলোকেরা প্রায় আর্যদের মত সদাচারসম্পন্না বলে তারা রতিক্রিয়ার শুচি উপচারের প্রয়োগ পছন্দ করে থাকে। তারা আলিঙ্গন করতে ভালবাসে, কিন্তু চুম্বন, নখক্ষত এগুলি ভালবাসে না।

বাহ্লীক দেশ এবং অবন্তীপুর রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা চুম্বনাদির ওপর বিরূপ। কিন্তু তারা চিত্ররত অর্থাৎ অস্বাভাবিক মিলন, জলে সঙ্গম, দন্ডায়মান অবস্থায় রমণ ইত্যাদি খুব পছন্দ করে।

পূর্ব মালবদেশে এবং আভীর দেশের (কুরুক্ষেত্র পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) নারীরা সহবাসকালে আলিঙ্গন, চুম্বন, নখদন্তচ্ছেদ্য, কামাবেগে আঘাত ইত্যাদি বড়ই পছন্দ করে। তাদের শৃঙ্গারে এগুলি মুখ্যস্থান অধিকার করে, তবে তারা মৃদু নখদন্তাঘাত পছন্দ করে—তার ফলে আঘাত সৃষ্টি হওয়া পছন্দ করে না।

বিপাশা, শতদ্রু ইত্যাদি পঞ্চনদের দেশে (পাঞ্জাব) যাদের জন্ম সেই নারীরা ঔপরিষ্টক (মুখমেহন) বড় ভালবাসে। আলিঙ্গন চুম্বনাদি তাদের প্রিয় বটে, তবে তারা আসল ক্রিয়াদি মুখেই সম্পন্ন করে।

পশ্চিমসাগরের (আরবসাগর) নিকটবর্তী দেশ ও লাটদেশের (দক্ষিণ গুজরাট) মেয়েরা অতিশয় কামুক, কিন্তু তারা সীৎকার অর্থাৎ রতিক্রিয়াকালে ধ্বনি) এবং অল্প প্রহার ভালবাসে—প্রচন্ড আঘাত সহ্য করতে পারে না।

বজ্রবন্ত দেশের পশ্চিমদিকস্থ স্ত্রীরাজ্য এবং কোশল দেশের নারীরা বড় কামাতুরা। চুলকানির আধিক্য তাদের বেশি—তাই অতি দ্রুত তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সহবাসকালে প্রচন্ড আঘাত, সুদৃঢ় আলিঙ্গন তারা সহ্য করতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র পুরুষসহবাসে তারা তৃপ্ত হয় না। প্রায় পুরুষ অঙ্গের মত আকৃতিবিশিষ্ট নানাপ্রকার দ্রব্য (কৃত্রিম) যোনিতে প্রবিষ্ট করিয়ে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করে থাকে।

অন্ধ্রদেশের নারীরা নম্রস্বভাবা ও কোমলাঙ্গী, তারা রতিপ্রিয় কিন্তু সহবাসকালে প্রচন্ড প্রহার সহ্য করতে পারে না। তবে তারা পুরুষের বুকে উঠে রতিক্রিয়া করতে ভালবাসে। তারা সুরুচি ও সদাচারবর্জিত।

নর্মদা নদী ও কর্ণাটের মধ্যবর্তী মহারাষ্ট্র দেশের নারীরা নানা প্রকার কলার অনুরাগিণী। তারা যেমন নিজেরা নানা অশ্লীল ও পরুষবাক্য বলে থাকে, তেমনি তা শুনতেও খুব ভালবাসে। তারাই প্রথমে সক্রিয় হয়ে ধৃষ্টতা সহকারে এবং উদ্ভটভাবে পুরুষের ওপর বলাৎকারের উপক্রম করে থাকে।

নাগর দেশের (কেউ কেউ বলে, বর্তমান জয়পুর রাজ্য) নায়িকারাও মহারাষ্ট্র দেশের মত স্বভাববিশিষ্টা। তারাও চৌষট্টি কলার অনুশীলন করে, তবে অশ্লীল বাক্যাদি প্রয়োগ প্রত্যক্ষভাবে করে না।

কর্ণাট দেশের (দক্ষিণে দ্রাবিড় দেশ) স্ত্রীলোকেরা চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদির দ্বারা উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে পর যোনিতে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট করায়। এই অবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল করে দেয়—তাদের যোনি থেকে অল্প রসক্ষরণ হয়। একবার মাত্র রতিক্রিয়ায় এরা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

পাটলিপুত্রের (পাটনা বা বিহার) নায়িকারা সর্বপ্রকার কলার ধীর প্রয়োগ পছন্দ করে। কিছু কিছু বাদ দিলে তারা ততটা তুষ্ট হয় না। তবে মার্জিত রুচি তাদের আছে।

কোঙ্কন দেশের (গোয়া) স্ত্রীলোকদের উত্তেজনা মাঝারি রকম। তারা চুম্বন, আলিঙ্গন, পীড়ন ইত্যাদি সব পছন্দ করে। (অবশ্য বেশি চন্ড প্রহার ছাড়া) নিজেদের দেহের ত্রুটি ঢাকতে তারা পটু কিন্তু পরের দৈহিক ত্রুটি নিয়ে পরিহাস করে থাকে। নিজেরা অশ্লীল বাক্য বলে না—শুনতেও চায় না। কঠোরভাষী, কদাচারী পুরুষকে তারা ঘৃণা করে।

এখন গৌড় দেশের স্ত্রীলোকদের কথা বলা হচ্ছে। গৌড় বলতে অবশ্য বাংলাদেশ বোঝায়। গৌড়ীয় নারীরা মৃদুভাষিণী, অনুরাগবর্তিনী এবং কোমলাঙ্গী।

এদের কাম-উত্তেজনা মাঝারী ধরনের—এরা মৃদু কামক্রীড়া পছন্দ করে। নিজেদের অঙ্গের দোষ ঢেকে রাখে—অশ্লীল বাক্যকে ভীষণ ঘৃণা করে—কটুভাষী কুৎসিত পুরুষকে স্পর্শ করতে চায় না।

এরা অত্যন্ত লজ্জাশীলাও বটে।

বিভিন্ন দেশের বর্ণনা শেষ হলো।

সুবর্ণনাভের মতে স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী চুম্বন ইত্যাদি করা যায় বটে, তবে দেশাচার অপেক্ষা নারী ও পুরুষের নিজস্ব রুচি ও পছন্দ বেশি কার্যকরী।

শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি এ কথা বলেছেন বটে, তবে একটা কথা—যদি নিজের রুচি দেশাচারের চেয়ে পৃথক হয় তবে তা প্রযোজ্য ঠিক, তা না হলে দেশাচার মানতে হবে।

কালের গতিতে এক দেশের শৃঙ্গার-বিধি, রতিক্রিয়ার আসন ইত্যাদি অন্যদেশে নীত হয়েছে।

তাই রুচি ইত্যাদির মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এক দেশের দেশাচার হয়ত অন্য দেশের লোকও মেনে চলেছে—অবশ্য—সেটা তাদের ভাল লাগে বলে।

শৃঙ্গার এক ধরনের কলা। এতে নৈপুণ্য অর্জন আয়াসসাধ্য। তাই খুব যত্ন সহকারে এগুলি অনুশীলন করা উচিত।

কামক্রীড়ার সবচেয়ে সহজ ও অল্পায়াসসাধ্য হলো আলিঙ্গন। তার চেয়ে চুম্বনের কলা জটিল। তার চেয়েও নখচ্ছেদ, দশনচ্ছেদ, তার চেয়েও প্রহার সীৎকার জটিলতর। বিনা সাধনায় এগুলিতে অভ্যস্ত হওয়া যায় না।

প্রণয় কলহ—নায়িকা আকার ইংগিত অনুনয় বিনয় এবং ভাবভঙ্গি দ্বারা বারণ করলেও নায়ক যদি তা না শুনে তার অঙ্গে নখক্ষত, দন্তক্ষত করে দেয়, তাহলে নায়িকা তা সহ্য করবে না। সে দ্বিগুণ উৎসাহে নায়কের দেহ ক্ষত বিক্ষত করে তার অত্যাচারের শোধ তুলবে।

নায়ক যদি বিন্দু অংকিত করে নায়িকা করে বিন্দুমালা। বিন্দুমালার বদলে অভ্রখণ্ডক; তার পরিবর্তে বরাহচর্বিতক। এমনি নানা আকারের ক্ষতচিহ্ন এঁকে ও উপাচার প্রয়োগ করে এমন ভাব দেখাবে যেন নায়কের আচরণে ক্রোধাবিষ্ট হয়েই সে তার সঙ্গে প্রণয় কলহে বাধ্য হয়েছে।

এখন প্রকাশ্য দিবালোকে রাত্রির সেই প্রণয় কলহের পরিণতি কি হবে সে কথা বলা হচ্ছে।

দিনের বেলা লোকজনের সমাগমে নায়ক-নায়িকা উভয়ে কৌশলে অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে।

নায়ক নিজের ক্ষত দেখিয়ে এমন ভঙ্গি করবে যেন সে নায়িকার কৃত ক্ষতচিহ্ন ঢেকে রাখতে লজ্জা পাচ্ছে।

নায়িকা তার উত্তরে ভঙ্গি দ্বারা বোঝাবে, আনাড়ি কেন এমন কাজ করতে আসে।

তারপরে দুজনেই অলক্ষ্যে মৃদু হাসবে।

এইরূপ করলে দুজনেরই অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সম্বেশন

(রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ভঙ্গি বা আসন)

পুরুষাঙ্গের সঙ্গে যোনির সংযোগ স্থাপনের জন্যে যে বিশেষ ভঙ্গিতে উপবেশন বা শয়ন করা যায়, তাকে বলে সম্বেশন।

আর এক প্রকার অস্বাভাবিক সুরত আছে তাকে বলে চিত্ররত। সুতরাং এই অধ্যায়ের দুটি অংশ—সম্বেশন ও চিত্ররত।

শৃঙ্গার দ্বারা নরনারী দুজনের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তাকে বলে রাগকাল।

শাস্ত্রে আছে—

রাগকালে বিশালয়ন্ত্যেব
জঘনং মৃগী সম্বিশেদুচ্চরতে।

এর অর্থ রাগকালে যদি মৃগ জাতীয়া স্ত্রীলোক উচ্চরতে (বৃষ বা অশ্বজাতীয় পুরুষ সহ) প্রবৃত্ত হয় তাহলে তাকে চিৎভাবে শয়ন করে জঙ্ঘা যতদূর প্রসারিত করা সম্ভব তা করে অবস্থান করতে হয়।

আর হস্তিনীজাতীয়া নারী যদি ক্ষুদ্র ধ্বজযুক্ত পুরুষের সঙ্গে নীচরতে প্রবৃত্ত হয় তাহলে তাকে উরুদ্বয়কে গুটিয়ে এনে যোনিমুখকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করতে হবে।

যেখানে ধ্বজ ও যোনির আকৃতি সমান (সমরত) সেখানে উরুদ্বয় প্রসারিত বা সংকুচিত কিছুই করতে হবে না। এমতাবস্থায় দুটি উরুকে স্বাভাবিক রেখে অবস্থান করতে হবে।

অবস্থাভেদে উপরে বর্ণিত তিনটি আসনের মধ্যে যে কোন একটিতে শায়িত বা উপবিষ্ট অবস্থায় থেকে নায়িকা নায়ককে নিজের জঘনে অর্থাৎ তলপেটের নিচে উরুদ্বয়ের মাঝখানে গ্রহণ করবে।

উৎফুল্লকং বিজৃম্ভিতকম্ ইন্দ্রানিকং
চেতি ত্রিতয়ং মৃগা মৃগা প্রায়েন।

এর অর্থ হলো মৃগজাতীয়া স্ত্রীলোককে যখন দীর্ঘ ধ্বজযুক্ত পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হতে হয় তখন সে প্রায়শঃই তিনপ্রকার আসন করে থাকে।

তা হলো—

(১) উৎফুল্লক (২) বিজৃম্ভিতক (জৃম্ভনের মত আকার) (৩) ইন্দ্রানিক (ইন্দ্রের মত)

উৎফুল্লক—নায়িকা বিছানায় বালিশের উপর নিতম্বে ভর রেখে উরুদ্বয় প্রসারিত করে জঘনকে উর্দ্ধমুখ করবে, ইহাতে যোনিমুখ ফুল্ল আননের মত ফাঁক হবে, এইজন্য একে বলা হয় উৎফুল্লক।

এখন নায়ক সেই বিস্তৃত যোনিমুখের সহিত পুরুষাঙ্গের সংযোগ স্থাপন করবে। সে ধীরে ধীরে লিঙ্গ একবার যোনিগহ্বরে প্রবেশ করাবে, আবার বাইরে নিয়ে আসবে। যতক্ষণ না রসক্ষরণ হয়ে যোনিপথ পিচ্ছিল হয় এবং লিঙ্গ যোনিগহ্বরে পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয় ততক্ষণ এইরূপ করতে থাকবে; মনে রাখতে হবে যে, এই প্রক্রিয়াটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না এভাবে আর্দ্রীভূত না করে ক্ষুদ্র যোনিতে হঠাৎ যদি বড় আকারের পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাবার চেষ্টা করা হয় তাহলে লিঙ্গমণির আবরণ চামড়া ছেড়ে গিয়ে পীড়া জন্মাতে পারে। চিকিৎসকেরা এ পীড়াকে বলেন অবপাটিকা।

বিজৃম্ভিতক—নায়িকা তার উরুদ্বয় ফাঁক করে বক্রভাবে উপরের দিকে তুলে ধরবে। এতে যোনির আকার হবে ঠিক হাইতোলা মুখের মত। জৃম্ভনের মত আকার বলে একে বিজৃম্ভিতক বলে।

ইন্দ্রানিক—নায়িকা নিজের হাঁটু দুটি ভেঙ্গে উরুতে এনে সংশ্লিষ্ট করবে। হাঁটু সমেত দুটি উরুকে বগলের দিকে টেনে এনে বিছানার ওপর রাখবে।

এত জানু এবং উরু শরীরের দুই কাঁকালের বাইরে থাকবে। ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী এই আসনের উপদেশ দিয়েছিলেন বলে এর নাম ইন্দ্রানিক। অভ্যাস দ্বারা এটি আয়ত্ত করতে হয়। এই আসনের বিষয় খুব সহজ নয়।

এই আসনে মৃগজাতীয়া নারীর সঙ্গে বৃষ ও অশ্ব পুরুষও অনায়াসে সহবাস করতে পারে।

এরপর শাস্ত্রে অন্য যে আসনগুলির কথা বলা হয়েছে তা হলো—

১। সম্পূটক	৫। ভগ্নক	৯। শূলাচিতক
২। পীড়িতক	৬। জৃম্ভিতক	১০। কার্কটক
৩। বেষ্টিতক	৭। উৎপীড়িতক	১১। পদ্মাসন
৪। বাড়বক	৮। বেণুদারিতক	১২। পরাবৃত্তক

এবারে একে একে এগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে। —

সম্পূটক—নায়ক নায়িকা উভয়ে যদি নিজেদের পা-গুলি বিছানার উপরে সোজাসুজি প্রসারিত করে দেয় তবে তাকে বলে সম্পূটক। পাশাপাশি অবস্থায়ও সম্পূটক চলতে পারে—তাই এটি দুভাগে বিভক্ত।

(১) পার্শ্ব সম্পূট (২) উত্থান সম্পূট।

পীড়িতক—উপর নিচ বা পাশাপাশি যে অবস্থাতেই সম্পুটক হোক না কেন, যোনিতে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্ট হবার পর নায়িকা জোর করে তা বাইরে বের করতে চেষ্টা করে ও নায়ক জোর করে তা ভেতরে রাখতে চেষ্টা করবে, তাকে বলে পীড়িতক আসন।

বেষ্টিতক—সম্পুটক আসনে জড়াজড়ি অবস্থায় থেকে যদি একে অপরের উরু বেড়ে ধরে তবে তাকে বলে বেষ্টিতক আসন।

বাড়বক—ঘোড়ার মত যোনির ওষ্ঠপুট (দুটি ঠোঁট) দ্বারা ধ্বজকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে চেপে ধরবে যে তা যেন যোনিগহ্বর হতে বের না হতে পারে। এটি অভ্যাসসাপেক্ষ।

অন্ধ্রদেশের স্ত্রীলোকেরা এতে অভ্যস্ত।

ভগ্নক—হস্তিনীজাতীয়া নারীদের জন্যে এই আসন। চিৎ হয়ে শুয়ে তার দুটি উরু গায়ে গায়ে লাগিয়ে উপরের দিকে তুলে ধরে উরু ভেঙ্গে রাখবে—একে বলে ভগ্নক।

জৃম্ভিতক—নায়ক নায়িকার পা দুটি তুলে নিজের কাঁধে রাখবে।

উৎপীড়িতক—নায়িকা নিজের পা দুটি উপরে উঠিয়ে বাঁকাভাবে নায়কের বুকের উপর ভাঁজ করে রাখবে, আর নায়ক নিজের বাহু দ্বারা নায়িকার গ্রীবা বেষ্টন করে ধরবে। এই ভঙ্গিতে পরস্পরের বুকে বুক লাগাবার চেষ্টা করবে। এই আসনে একে অপরকে পীড়ন করে বলে এর নাম উৎপীড়িতক।

বেণুদারিতক—নায়িকা নায়কের কাঁধের উপরে একখানি পা রাখবে অন্য পা-খানি মেলে দিবে। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে একবার ডান পা কাঁধের উপর, বাঁ পা প্রসারিত, তারপর বাঁ পা কাঁধের ওপর ডান পাশে প্রসারিত এইরূপ করতে থাকবে—একে বলে বেণুদারিতক।

শূলাচিতক—নায়িকা তার একটি পা ধনুকের মত বাঁকিয়ে এনে নিজের মাথার উপর স্থাপন করবে এবং আর একটি পা নিচে রাখবে। বহু যত্নে অভ্যাস করে এই আসনে অভ্যস্ত হতে হয়। নায়িকা মোটা হলে এটি সম্ভব নয়।

কার্কটক—নায়িকা হাঁটু মুড়ে রাখবে আর নায়ক তার পা নিজের নাভিমূলে স্থাপন করবে—একে বলে কার্কটক।

পদ্মাসন—নায়িকা চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটি উপরে উঠিয়ে ডান পা বাঁ উরুতে এবং বাঁ পা ডান উরুতে রাখবে—একে পদ্মাসন বলা হয়।

পরাবৃত্তক—নায়িকার পৃষ্ঠদেশ আলিঙ্গন করে যদি নায়ক পশ্চাৎ থেকে সহবাস করতে পারে তবে তা পরাবৃত্তক।

চিত্ররত

উপরে যে সব আসনের বর্ণনা করা হলো সেগুলি রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক আসন। চিৎ হয়ে বা পাশাপাশি শুয়ে নায়ক নায়িকা এই সব আসনে মৈথুন করে। কিন্তু এছাড়া আরো কতকগুলি আসন আছে যা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

এই অস্বাভাবিক সঙ্গমকে বলে চিত্ররত।

চিত্ররত আসনের বহু প্রকারভেদ আছে। তার মধ্যে কিছু বলা হচ্ছে। শাস্ত্রমতে দন্ডায়মান অবস্থায় চিত্ররতকে স্থিররত বলে। তা তিন ভাগে বিভক্ত।

(১) **জারতসম্মুখ**—নায়িকার একখানি পা তুলে ধরে তার প্রসারিত যোনিমুখে নায়কের ধ্বজ প্রবিষ্ট করানোকে বলে জারতসম্মুখ।

(২) **দ্বিতল**—পুরুষ নারীর মুড়ে রাখা হাঁটু দুটি নিজের দুই হাতে ধরে মৈথুনে প্রবৃত্ত হলে তাকে বলে দ্বিতল।

(৩) **জানুকুর্পর**—স্ত্রীর গুটানো হাঁটু দুটি নিজের দুই কনুইয়ের ওপর রেখে তাকে মাটি থেকে উপরে তুলে সম্প্রয়োগ করলে তাকে বলে জানুকুর্পর। এটি খুব সাবধানে অভ্যাস করা উচিত।

অবলম্বিতক চিত্ররত—নায়ক একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তার দুটি করতল সংযুক্ত ভাবে নায়িকার পাছার দিকে রাখবে। নায়িকা সেই যুক্ত করতলের উপরে বসে বাহুদ্বারা নায়কের কণ্ঠ আলিঙ্গন করবে এবং দুটি উরু দিয়ে তার জঙ্ঘা বেড়ে ধরবে। যে স্তম্ভে হেলান দিয়ে নায়ক দাঁড়িয়ে থাকবে, পা দিয়ে তাকে বারবার ঠেলা দিতে অথবা চাপ দিতে হবে।

ধেনুক চিত্ররত—গাভী যেমন সঙ্গমকালে মুখ নিচু করে তার পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়, স্ত্রী তেমনি অধোমুখে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে মাটির উপরে অবস্থান করবে—পুরুষ থাকবে পেছনে—একে বলে ধেনুক।

চিত্র সঙ্ঘাটক—যদি নায়ক দুটি নায়িকার বিশ্বাস একই সঙ্গে আকর্ষণ করে দুজনের সঙ্গে একই শয্যার তলে পর্যায়ক্রমে ক্রীড়া করতে পারে তার নাম চিত্র সঙ্ঘাটক।

এক্ষেত্রে নায়ক যেমন রতিক্রিয়া দ্বারা একজনকে তৃপ্ত করবে, তখন এক সঙ্গে অন্যের সঙ্গে শৃঙ্গার করবে। আবার তারপর রমণ করে তাকে তৃপ্ত করবে।

গোযূথিক—ষাঁড় যেমন একই সঙ্গে একপাল গাভীর সঙ্গে সঙ্গম করে, যদি তেমনিভাবে কোনও পুরুষ একাধিক নায়িকাকেও তৃপ্ত করে তার নাম গোযূথিক।

রাজ-অন্তঃপুরে বা অন্যত্র সে আসনে এরূপ হতো বলে জানা যায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রহণন—রতিক্রিয়ার সময় কাম উত্তেজনার প্রাবল্যে নায়ক যদি নায়িকার দেহে আঘাত করতে থাকে তবে তাকে বলে প্রহণন।

সীৎকৃত—প্রহণনের উত্তরে নায়িকা যে অস্ফুট ধ্বনি করে তাকেই শাস্ত্রে বলে সীৎকৃত।

প্রহণনের স্থান কয়টি এ বিষয়ে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

১। কাঁধ

২। মাথা

৩। স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান

৪। পিঠ

৫। জঘন

৬। পার্শ্বদ্বয় ও নিতম্ব

আঘাতের মধ্যে প্রকারভেদ আছে—

১। অপহস্তক—করপৃষ্ঠ দিয়ে আঘাত।

২। প্রসৃতক—হাতের আঙ্গুলগুলি ফণার মত করে আঘাত।

৩। মুষ্টি—হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ধীরে ধীরে আঘাত।

৪। সমতলক—উপরে উপরে বারবার চপেটাঘাত।

শাস্ত্রমতে নারীদেহে তিনটি প্রধান রাগস্থান আছে। তা হলো—

১। মস্তক। ২। যোনি ও উরু। ৩। হৃদয় বা স্তন। এই সব স্থানে আঘাত করতে থাকলে যে নারীর কাম উত্তেজনা সহজে উপশম হয় না, সেও খুব অল্প সময়ে পুলকলাভ করে।

সীৎকৃতকে প্রহণনেরই প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। নায়ক আঘাত করলে নায়িকা মুখ দিয়ে শব্দ করবে। না লাগলেও বা আরাম বোধ হলেও সে ব্যথা পাবার অনুরূপ ধ্বনি করতে থাকবে।

সীৎকৃতের আবার প্রকারভেদ আছে শাস্ত্রে—

১। হিংকার—সহবাসকালে অনুনাসিক হিং শব্দের অনুরূপ যে শব্দ হয় তাকে বলে হিংকার।

২। স্তনিত—রমণকালে প্রত্যেকবার কটিচালনার সঙ্গে সঙ্গে হং শব্দের অপরূপ যে ধ্বনি তাকে স্তনিত বলে।

৩। কূজিত—পাখির কূজনের মত শব্দ।

৪। রুদিত—রোদনের মত অথবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার মত ধ্বনিকে রুদিত বলে।

৫। সুৎকৃত—বেগে নিঃশ্বাস পতনের শব্দ।

৬। ফুৎকৃত—ফুঁ দেবার অনুরূপ শব্দ।

৭। দুৎকৃত—বাঁশ কাটলে যেমন শব্দ হয়, জিহ্বা তালুর সাহায্যে তেমনি শব্দ করাকে দুৎকৃত বলে।

শাস্ত্রে প্রহণনের কথায় বলা হয়েছে—নায়িকা পছন্দ না করলে তা কদাচ করা উচিত নয়।

তা ছাড়া নির্দয় আঘাত করা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ও ঘৃণিত। এই ধরনের শৃঙ্গারের ফলে কি ভয়াবহ পরিণাম ঘটতে পারে, এ বিষয়ে শাস্ত্রে বলা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ—

১। দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্যের জনৈক রাজা রতিক্রিয়া আরম্ভ কালে কামোত্তেজনার বশে চিত্রসেনা নামক এক রক্ষিতার বুকে কিল মারলে তিনি মারা যান।

২। কুন্তলদেশের রাজা শতকর্ণের পুত্র শালিবাহন পাটরাণী মলয়াবতীকে মদন উৎসবের সময় প্রহার করলে তিনি মারা যান।

শাস্ত্রে তাই বলেছে—

দুর্বার বেগে ধাববান অশ্ব যেমন ঝোপঝাড় খানাডোবা গিরিগহ্বর না মেনে রাগান্ধ হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে, ঠিক তেমনি রতিক্রিয়ার সময় কোনও ভাবেই মনের স্থিরতা রাখা যায় না। তাই শাস্ত্রের এই বিষয়ে মনস্থির রেখে সব সময় শৃঙ্গার ইত্যাদি করতে হবে।

পুরুষায়িত বা বিপরীত বিহার

রমণকালে নায়িকা যদি বুঝতে পারে যে নায়ক অবিরত কটিচালনা করে ক্লান্ত হয়েছে কিংবা শুক্রস্খলন বা চরম পুলক হয়নি তা হলে নায়কের সম্মতি নিয়ে তাকে নিচে ফেলে সে পুরুষের মত আচরণ করবে। অর্থাৎ চিৎভাবে শায়িত নায়কের বুকের উপরে উঠে নিজেই কটিচালনা করে ক্রিয়া সমাপ্ত করায় তাকে সাহায্য করবে।

অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নায়িকা বা নায়ক বৈচিত্র্য বা আমোদের জন্য অথবা কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য এরূপ করতে পারে।

এই পুরুষায়িতের দুটি প্রকারভেদ আছে—

(১) নায়িকা এমন কৌশলে নায়ককে নিচে ঠেলে নিজে উপরে উঠবে যেন ক্রিয়া বিযুক্ত না হয় অর্থাৎ রতিক্রিয়ার রস অবিচ্ছিন্নভাবেই চলতে থাকে।

(২) একেবারে দুজনে বিমুক্ত হয়ে আবার নতুন করে ক্রিয়া সুরু করতে হবে।

নায়ক শ্রান্ত হয়ে পড়লে অবশ্যই এই উপায় অবলম্বন বিশেষ উপযোগী মনে হয়।

বিপরীত বিহার কালে নায়িকা ঠিক পুরুষের মত আচরণ করবে অর্থাৎ যে ধরনের শৃঙ্গারাদি নায়ক করতে থাকে, সেও তাই করবে।

শাস্ত্রে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিপরীত বিহার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা হলো—

১। ঋতুমতী স্ত্রীলোক।
২। সদ্যপ্রসূতা।
৩। মৃগীজাতীয়া বা ক্ষুদ্রযোনি বিশিষ্টা
৪। গর্ভিণী।
৫। অত্যন্ত দীর্ঘ নারী।
৬। নায়িকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

ঔপরিষ্টক

যদিও ঔপরিষ্টক বা মুখমেহন শাস্ত্রকারগণ তীব্র নিন্দাজনক কাজ বলেছেন, তবু এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

জননেন্দ্রিয় নারী যদি মুখে গ্রহণ করে তবে তাকে ঔপরিষ্টক বলে।

বেশ্যা, স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীলোক, পরিচারিকা, অঙ্গমর্দনকারিণী—এরা এই কাজ দ্বারা জীবিকা অর্জন করে বলা হয়েছে।

ধর্মশাস্ত্রে এটি বিরুদ্ধ কাজ বলা হয়েছে। বাৎস্যায়ন বলেছেন—বেশ্যাদের দ্বারা ও কাজ চললেও বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে এটি অত্যন্ত নিন্দার্হ ও ঘৃণিত।

সর্ব শাস্ত্রেই মুখমেহনকে অতি নিন্দার্হ বলে গণ্য করা হয়েছে। যদিও এটি কামকলায় লিখিত হয়েছে—তবু এটি যে ব্যবহার করা উচিত নয়—অন্ততঃ বিবাহিত জীবনে, তা বহু প্রমাণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাই এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হলো না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন রোগব্যাধি

শাস্ত্রে মোট রোগব্যাধিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। তীব্ররতি—যে নারী বা পুরুষের রতি অতি ঘন ঘন অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও অনেক ঘন ঘন হয়, সেটি একটি রোগবিশেষ হয়ে দাঁড়ায়।

২। হীনরতি—যে নারী বা পুরুষ ক্লীবের মত—অর্থাৎ যাদের যৌন জড়তা ও যৌন অতৃপ্তি বা ইচ্ছা বিরুদ্ধ কর্ম হয়ে দাঁড়ায়, তারা শুধু মানবিক নয়—শারীরিক দিক থেকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় এসে দাঁড়ায়।

৩। অক্ষমরতি বা ক্লীবত্ব—যাদের রতিক্ষমতা একেবারেই নেই, তাদের ক্লীব বলা হয়।

৪। দুষ্টরত—যাদের রতি দূষিত অর্থাৎ কোন রোগগ্রস্ত।

এটি আমাদের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে দুটি ভাবে বিভক্ত ভারতীয় শাস্ত্রেও ঠিক তাই।

১। মেহ　　　　২। প্রমেহ

এই দুটি রোগই বিদেশী শাস্ত্রে গণোরিয়া ও সিফিলিস এই দুটি ভাগে বিভক্ত।

জননযন্ত্রের এই রোগ বিশেষ চিকিৎসাসাপেক্ষ এবং তা না করলে বংশ পরম্পরা পর্যন্ত সংক্রামিত হয়ে শিশু ও তাদের বংশের সকলের জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে।

মেহ রোগের রক্ষণ—

১। যৌনাঙ্গে ঘা।　　২। মাথা ধরা, মাথা ঘোরা।

৩। ঘোলাটে প্রস্রাব করতে থাকা।　　৪। শরীরের অন্য অংগেও ঘা।

৫। প্রস্রাবে অসহ্য জ্বালা।　　৬। গা বমি বমি করা।

প্রমেহ রোগের লক্ষণ—

১। যৌনাঙ্গে বলিবৎ বা গুটিকাবৎ ফুস্কুড়ি।

২। দেহের বিভিন্ন স্থানে ঐ রূপ ফুস্কুড়ি।

৩। প্রস্রাবে কিঞ্চিৎ জ্বালা ও গুটি থেকে ঘায়ের সৃষ্টি সুরু হওয়া।

৪। মাথা ধরা, কর্মে ক্লান্তি ও বিরক্তি।

ধীরে ধীরে এটি রক্তও দূষিত করতে পারে বলে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

চিকিৎসা

যদিও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ছাড়া এসব রোগ কখনও আরোগ্য হয় না, তবু শাস্ত্রে আয়ুর্বেদ মতে যে চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে তা দেওয়া হচ্ছে—

তীব্ররতি—যাদের ঘন ঘন অতিরিক্ত মাত্রায় রতি হতে আরম্ভ হয় তাদের প্রথমে দেহ ও মনকে শান্ত করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রমতে।

এ জন্যে যা যা করতে হবে তা হলো—

১। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ।

২। প্রচুর জলপান ও নিয়মিত সময়ে খাদ্য গ্রহণ।

৩। রাত্রি জাগরণ না করা।

৪। নিয়মিত স্নান করা।

৫। ঘোল, ডাব ইত্যাদি শরীর স্নিগ্ধকর খাদ্য গ্রহণ করা।

৬। ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া) ভিজানো জল প্রত্যহ ভোরে সেবন!

৭। রতি-উত্তেজক কোনও গ্রন্থপাঠ না করা।

এছাড়া আয়ুর্বেদে ব্রাহ্মী ঘি, আমলা তেল ইত্যাদির বিধান আছে।

রতিশক্তি বৃদ্ধির বিভিন্ন ঔষধ

এবারে যাদের রতিশক্তি হীন বা পুরুষত্ব হানি হয়েছে তাদের বিষয়ে যে ঔষধ তা বলা হয়েছে—

(১) চিনি মেশানো দুধে উচ্চটানন্দ এবং যষ্টিমধু শুকিয়ে তা গুঁড়ো করে মিশিয়ে খেলে বৃষের মত রমণক্ষমতা হয়।

(২) বালা, নাগবালা, শতকরি, বাসরী, গোক্ষুরক শুষ্ক করে গুঁড়ো করে যে দুধের সঙ্গে একত্র মিশ্রিত করে খায় সে প্রচুর রতিশক্তি লাভ করে। সে মল্লের মত বীরত্ব পায়।

(৩) ভেড়া বা ছাগলের অণ্ডকোষ দুধে দীর্ঘকাল সিদ্ধ করতে হবে। তারপর তা ছেঁকে ফেলে সেই দুধ চিনি মিশিয়ে পান করতে পারলে প্রচুর রতিক্ষমতা হয়ে থাকে।

(৪) ঘি—সাড়ে ১২ কে. জি.
চিনি—পঁচিশ কে. জি.
মধু—আড়াই'শ গ্রাম

এই তিনটি জিনিস বেশ উত্তমরূপে মেশাতে হবে।

গমের সঙ্গে আড়াই'শ গ্রাম জল মিশিয়ে তা উপরের জিনিসের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করতে হবে। যে ব্যক্তি এই পিষ্টক খায় সে গর্বিতা কাম-উন্মাদিনী নারীকেও সহজেই পরাস্ত করতে পারে।

(৫) তিলবীজ বারবার দুধে ভিজিয়ে যদি পাঁঠার অন্ডকোষের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া যায় তবে তা ভাল।

পাঁঠার অন্ডকোষ-দুটি ঘি এবং দুধ দিয়ে সিদ্ধ করে লবণ ও গুড় মিশিয়ে খেলে প্রচুর রতিক্ষমতা লাভ করা যায়।

(৬) নিয়মিত মেটে ও পাঁঠার অন্ডকোষ একত্রে মিশিয়ে ডালনা করে খেলে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৭)	ঘি	—	১০০ গ্রাম
	মধু	—	১০০ গ্রাম
	চিনি	—	১৫০ গ্রাম
	যষ্টিমধু	—	১৫০ গ্রাম
	আঙ্গুরের রস	—	২৫ গ্রাম
	দুধ	—	১ কে. জি.

এই কটি জিনিস মিশিয়ে পান করলে মেধা, লাবণ্য, আয়ু বৃদ্ধি পায়। রতিক্ষমতা বাড়ে ও দেহের পুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

(৮)	ঘি	—	২৫০ গ্রাম
	দুধ	—	১.২৫০ কে. জি.
	শতকরি	—	১ কে. জি.
	মগধিকা	—	১ কে. জি.
	মধু	—	১ কে. জি.
	চিনি	—	১ কে. জি.

এগুলি একত্রে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে খেলে পুরুষ প্রচুর শক্তি ও যৌন ক্ষমতা লাভ করে।

(৯)	শ্বেতপদ্মের পুংকেশর	—	২০ গ্রাম
	সহদেবী	—	২০ গ্রাম
	ঘি	—	১২৫ গ্রাম
	মধু	—	১২৫ গ্রাম

এগুলি একত্রে বেশ ভাল করে মিশিয়ে পেটে নিয়মিত প্রলেপ লাগালে সে শত রমণীকেও তুষ্ট করতে পারে বলে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এগুলি ছাড়াও আরও নানা ঔষধ আছে।

মেহ ও প্রমেহ রোগের শাস্ত্রে ঔষধ বিধান আছে বটে, তবে ঐ রোগ হলে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুযায়ী চিকিৎসা করাই ভাল।

আর একটা কথা, শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী রোগের প্রতিষেধক স্বরূপ উপাদানগুলি অনেক সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। গেলেও তা আজকের দ্রব্যমূল্যের বাজারে বড় কম নয়। সুতরাং অনিশ্চিত চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করার চেয়ে নিশ্চিত চিকিৎসায় কিছু বেশি অর্থ ব্যয় করাও ভাল। যৌনরোগ এমন একটি রোগ যার উপর নিজের যাবতীয় বিষয় তো বটেই স্ত্রী অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বহুলাংশে নির্ভর করে। আবার কোন কোন যৌনরোগ অত্যন্ত সংক্রামক তা বংশপরম্পরায় ছড়িয়ে পড়তেও পারে।

আধুনিক চিকিৎসা এখন অনেক উন্নত যা আগের যুগে ছিল না। তখন মানুষকে রোগ ব্যাধিতে আয়ুর্বেদিক বা গাছ-গাছড়ার উপর নির্ভর করতে হত। যদিও আজকের চিকিৎসা বা রোগব্যাধির ঔষধপত্র তারই অত্যাধুনিক রূপ। আজকের বিজ্ঞান তাকে শুধু আরও উন্নত, উপযোগী এবং তাৎক্ষণিক করেছে। সুতরাং মেহ বা প্রমেহ, সিফিলিস বা গনোরিয়া এধরনের মারাত্মক রোগের ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে মনের সমস্ত জড়তা কাটিয়ে আধুনিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।

ফ্রী

দেবদেবীর রঙিন এ্যালবাম

শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা

কালও ছিল
আজও আছে

ব্যবহার করুন দৈনিক রাশিফল সহ

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১